grohon.com

সবুজ ভূত

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ১৯৮৭

তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে চমকে উঠল রবিন মিলফোর্ড আর মুসা আমান।

পুরানো ড্রাইভ ওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, চারপাশে আগাছার জঙ্গল। চোখ মস্ত এক পোড়ো বাড়ির দিকে। এক পাশ থেকে ভেঙে ফেলা শুরু হয়েছে, নতুন বাড়ি করা হবে। চাঁদের আলোয় কেমন যেন অবাস্তব, রহস্যময় মনে হচ্ছে ভাঙা বাড়িটাকে।

রবিনের কাঁধে ঝোলানো একটা পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার, চালু করে দিয়ে পরিবেশ আর দৃশ্যাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছে জোরে জোরে, টেপ করে নিচ্ছে। চিৎকার শুনে চুপ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্যে। মুসার দিকে ফিরে বলল, 'লোকে বলে, ভূতুড়ে বাড়ি। ভূতের চিৎকার না তো?'

যেন তার কথার জবাব দিতেই আবার শোনা গেল টানা চিৎকার ঃ ইইইইইই-আআআআহ্হ্! মানুষ না, যেন কোন জানোয়ারের কণ্ঠ। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল ছেলেদুটোর।

'ভূতই!' ঢোক গিলল মুসা। চাপা কণ্ঠে বলল, 'চলো, পালাই।'

'দাঁড়াও,' ঘুরে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা রোধ করল রবিন। দ্বিধা করছে মুসা, তার দিকে চেয়ে বলল, 'দেখি আর কোন শব্দ হয় কিনা। রেকর্ড করে নেব। কিশোর হলে তা-ই করত।'

গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা আসেনি ওদের সঙ্গে।

'কিন্তু…,' থেমে গেল মুসা। ভল্যুম কন্ট্রোল ঠিক করে মাইক্রোফোন বাড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরেছে রবিন, যদি আর কোন আওয়াজ না হয়।

হলো। আবার সেই আগের মতই টানা চিৎকারঃ ইইইইইই-আআআআহ্হ্।

'আর না, চলো ভাগি!' ঘুরে ছুটতে শুরু করল মুসা।

একা দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না রবিনের, মুসার পিছু নিল সে-ও, পার্ক করে রাখা সাইকেলের দিকে।

হঠাৎ জোর করে ধরে তাদের থামিয়ে দিল কেউ।

'আউউ!' লম্বা এক লোকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মুসা। ববকে ধরেছে বেঁটে আরেকজন।

বেশ কয়েকজন লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে, গায়ে পড়ার আগে খেয়ালই করেনি দুই গোয়েন্দা। চিৎকার শুনে বোধহয় দেখতে এসেছে লোকগুলো,

grohon.com

কি হচ্ছে বাড়িতে।

'তুমি তো মিয়া ফেলেই দিয়েছিলে আমাকে,' মুসাকে বলল লম্বা লোকটা।

'কিসের চিৎকার?' জিজ্ঞেস করল বেঁটে লোকটা রবিনকে। 'দেখলাম দাঁড়িয়েছিলে, তারপরই দৌড় দিলে।'

'জানি না,' বলল মুসা, 'ভূত ছাড়া আর কি?'

'ভূত? বোকা কোথাকার। মানুষের চিৎকার। কেউ বিপদে পড়েছে।'

একই সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল পাঁচ-ছয়জন লোক, মুসা আর রবিনের উপস্থিতি ভুলেই গেল। নানারকম মন্তব্য করছে ওরা। সব ক'জনই ভদ্রলোক, অন্তত পোশাকে আশাকে তা-ই মনে হচ্ছে। বোধহয় প্রতিবেশী, রাতের বেলা পোড়ো বাড়িতে চিৎকার শুনে তদন্ত করে দেখতে এসেছে।

'চলুন, ঢুকে দেখি,' প্রস্তাব দিল একজন। অস্বাভাবিক ভারি কণ্ঠ, জোরে জোরে কথা বলে। চাঁদের দিকে পেছন করে রয়েছে, লোকটার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেল না রবিন, তবে গোঁফ আছে দেখা যাচ্ছে। 'বাড়ি ভাঙা হচ্ছে শুনে দেখতে এসেছিলাম। পুরানো বাড়ি, যদি কিছু বেরোয়-টেরোয়? ...চিৎকার শুনেছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইঁট খসে পড়েছে কারও মাথায়।'

'পুলিশকে খবর দেয়া দরকার,' বলল আরেকজন। কণ্ঠে দ্বিধা। পরনে চেককাটা স্পোর্টস জ্যাকেট। 'ওরা ঢুকে দেখুক কার কি হয়েছে।'

'নিশ্চয় কেউ ব্যথা পেয়েছে,' বলল ভারি কণ্ঠ। 'চলুন দেখি সাহায্য করতে পারি কিনা। পুলিশের জন্যে দেরি করলে মরেও যেতে পারে।'

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিল ভারি লেন্সের চশমা পরা একজন। 'চলুন, আগে আমরাই গিয়ে দেখি।'

'আপনারা যান, আমি পুলিশ ডেকে আনছি,' বলল চেক-জ্যাকেট।

একজনের সঙ্গে ছোট এক কুকুর, কুকুরের গলার চেন ধরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছিল এতক্ষণ বাড়িটাকে। চেক-জ্যাকেটকে ডেকে বলল, 'আরে কই যাচ্ছেন, সাহেব? পেঁচার ডাকও হতে পারে। শেষে লোক হাসাবেন তো। থামুন।'

থেমে গেল চেক-জ্যাকেট, দ্বিধা করল, ঘুরল। 'ঠিক আছে...'

নেতৃত্ব দিল বিশালদেহী একজন লোক, কৌতূহলী জনতার সব ক'জনের মাথাকে ছাড়িয়ে গেছে তার মাথা, সেই অনুপাতে শরীর। বলল, 'আসুন, সবাই। ছ'সাতজন আমরা, টর্চও আছে। ঢুকে দেখি, তেমন কিছু দেখলে পুলিশ ডাকা যাবে। এই যে ছেলেরা, বাড়ি যাও, তোমাদের আসতে হবে না।'

পাথরে তৈরি পথ ধরে গটগট করে হেঁটে চলল সে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে অনুসরণ করল অন্যেরা। কুকুরের মালিক আর চেক-জ্যাকেট রয়েছে সবার পেছনে, নির্ভয় হতে পারছে না।

'এসো,' রবিনের হাত ধরে টানল মুসা, 'বাড়ি চলে যাই।'

'কিসের শব্দ না জেনেই?' রবিন যেতে চাইছে না। 'কিশোর কি ভাববে? তার পিন-মারা সইতে পারবে? আমরা গোয়েন্দা, এভাবে চলে যাওয়া উচিত না। তাছাড়া এখন আর ভয় কি? অনেক লোক।'

লোকগুলোর পেছনে রওনা হলো রবিন। মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুসা তার পিছু নিল।

বাড়ির মস্ত সদর দরজায় এসে দাঁড়াল লোকগুলো। এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। অবশেষে দরজায় ঠেলা দিল বিশালদেহী লোকটা। খুলে গেল পাল্লা। ওপাশে গাঢ় অন্ধকার।

'টর্চ জ্বালান,' বলল নেতা। 'দেখি কি আছে।'

নিজের হাতের টর্চ জ্বেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। অন্ধকার চিরে দিল আরও তিনটে উজ্জ্বল আলোক রশ্মি। লোকগুলো সব ঢোকার পর ওদের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে ভেতরে পা রাখল দুই গোয়েন্দা।

বিরাট এক হলরুম। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখতে লাগল লোকেরা। বিবর্ণ সিল্কের কাপড়ে দেয়াল ঢাকা, কাপড়ে আঁকা প্রাচ্যের নানারকম দৃশ্যের রঙও চটে গেছে জায়গায় জায়গায়।

হলের এক জায়গা থেকে উঠে গেছে সুদৃশ্য সিঁড়ি, তাতে আলো ফেলল একজন।

'ওটা থেকে পড়েই বোধহয় পঞ্চাশ বছর আগে ঘাড় ভেঙেছিল চীনা বুড়ো ফারকোপার কৌন,' বলল যে লোকটা সিঁড়িতে আলো ফেলেছে সে। 'উঁহ্, গন্ধ! পঞ্চাশ বছরে ঘর খোলেনি নাকি কেউ?'

'কে খুলতে যাবে ভূতের বাড়ি?' বলল আরেকজন। 'এমন জায়গা, ভূত থাকা বিচিত্র নয়। এসে এখন দেখা না দিলেই বাঁচি।'

'যত্তোসব বাজে বকবকানি,' বিড়বিড় করল নেতা। 'আসুন, নিচতলা থেকেই খুঁজতে শুরু করি।'

বড় বড় একেকটা ঘর। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হতে লাগল। আসবাবপত্র নেই, মেঝেতে পুরু ধুলো। এক প্রান্তের ঘরে পেছনের দেয়াল অনেকখানি নেই, ওখান থেকেই ভাঙা শুরু করেছে শ্রমিকেরা।

কোন ঘরেই কিছু পাওয়া গেল না। শূন্য বাড়ি। কথা বললেই প্রতিধ্বনি উঠছে, ফলে জোরে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছে সবাই, ফিসফিস করে বলছে। এ-প্রান্তে কিছু নেই, বাড়ির অন্য প্রান্তের দিকে চলল ওরা। বড়সড় একটা পারলারে চলে এল। এক প্রান্তে বড় ফায়ারপ্লেস, আরেক প্রান্তে উঁচু জানালা। গুটি গুটি পায়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে এসে দাঁড়াল লোকেরা, অস্বস্তি বাড়ছে।

'আমাদের দিয়ে হবে না,' নিচু কণ্ঠে বলল একজন। 'পুলিশ...'

'শ্‌শ্‌!' হুঁশিয়ার করল আরেকজন, বরফের মত জমে গেল যেন সবাই। 'শব্দ!'

'ইঁদুর-টিদুর, ফিসফিস করে বলল তৃতীয় আরেকজন। 'আলো নেভান। অন্ধকারে নড়ে কিনা দেখি।'

নিভে গেল সব ক'টা টর্চ। ঘন কালো অন্ধকার গিলে নিল যেন মানুষগুলোকে। ধুলোয় ঢাকা ময়লা কাচের শার্সি দিয়ে চাঁদের আলো আসছে এত ম্লানভাবে, অন্ধকার একটুও কাটছে না।

'দেখুন!' বলে উঠল একজন, গলা টিপে ধরা হয়েছে যেন তার। 'দরজার

কাছে!'

একসঙ্গে ঘুরল সবাই। দেখল।

যে দরজা দিয়ে ওরা ঢুকেছে, ওটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক সবুজ মূর্তি। শরীর থেকে আবছা দ্যুতি বেরোচ্ছে, কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। রবিনের মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। ওটা কি? লম্বা একজন মানুষই তো, নাকি? গায়ে সবুজ ঢোলা আলখেল্লা?

'ভূত!' শোনা গেল দুর্বল কণ্ঠে চিৎকার। 'বুড়ো ফারকোপার কৌন!'

'আলো!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল বিশালদেহী লোকটা। 'টর্চ জ্বালুন।'

আলো জ্বালার আগেই নড়তে শুরু করল সবুজ মূর্তিটা। দেয়ালের ধার ধরে যেন বাতাসে ভেসে চলল, বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে। তিনটে আলোর রশ্মি ছুটে গেল মূর্তিটার দিকে, চোখের পলকে নেই হয়ে গেল ওটা।

'আমি মরে গেছি, দোজখে আছি এখন!' রবিনের কানে কানে বলল মুসা। 'ওটা দোজখের দারোয়ান।'

'গাড়ির আলো হতে পারে,' নিস্তেজ কণ্ঠে বলল একজন। 'জানালা দিয়ে এসেছে। চলুন তো, ওপাশের ঘরে গিয়ে দেখি।'

দল বেঁধে এসে ঢুকল সবাই পাশের বড় ঘরে, আরেকটা হলরুম। আলো ঘুরিয়ে দেখল। কিছু নেই। আলো নেভানোর পরামর্শ দিল একজন, তাহলে 'ভূতটা' আবার আসতে পারে।

অন্ধকারে অপেক্ষা করে আছে ওরা। চাপা গোঁ গোঁ করছে ছোট্ট কুকুরটা।

এইবার মুসা দেখল সবার আগে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সবাই। মুসাও তাকাচ্ছে, হঠাৎ চোখ পড়ল সিঁড়ির দিকে। 'ওই যে! আল্লাহ্‌রে খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'সিঁড়িতে!'

সবাই দেখল। সিঁড়ির ধাপগুলোর ওপর দিয়ে যেন বাতাসে ভেসে উঠে গেল মূর্তিটা দোতলায়।

'ধরো,' বলে উঠল বিশালদেহী লোকটা। 'বোকা বানাচ্ছে আমাদের। ধরো, ব্যাটাকে।'

দুপদাপ করে উঠতে শুরু করল সবাই। দোতলায় কেউ নেই। সবুজ মূর্তি গায়েব।

'হুম্‌ম্, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়,' কিশোরের ভঙ্গি নকল করে বলল রবিন। ঘুরে একজন আলো ফেলল তার মুখে। সবাই ফিরে তাকাল। 'এক কাজ করতে পারি। যে রকম ধুলো, নিশ্চয় পায়ের ছাপ ফেলেছে। ওই ছাপ অনুসরণ করে ধরে ফেলতে পারব ব্যাটাকে। আমরা এখনও ওদিকে যাইনি, ছাপ পড়লে শুধু ওটারই পড়বে।'

'ঠিক বলেছে, ছেলেটা,' সায় দিল কুকুরের মালিক। 'আলো ফেলুন। আলো ফেলে দেখুন।'

প্রচুর ধুলো আছে, কিন্তু তাতে পায়ের ছাপ নেই, অথচ ওদিকেই গেছে মূর্তিটা, স্পষ্ট দেখেছে সবাই।

'নেই!' বলল কুকুরের মালিক। 'অদ্ভুত কাণ্ড! কি দেখলাম তাহলে?'

কেউ জবাব দিল না। সবাই ভাবছে। প্রত্যেকে যেন পড়তে পারছে প্রত্যেকের মনের কথা।

'আবার আলো নিভিয়ে দেখা যাক তো,' বলল আগের বার যে পরামর্শ দিয়েছিল সে।

'চলুন কাটি এখান থেকে,' বলল আরেকজন, কিন্তু তার কথা ঢাকা পড়ে গেল অন্যদের সমর্থনে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আলো নিভিয়ে দেখা যাক।'

ভয় পাচ্ছে ঠিক, কিন্তু সেটা দেখাতে চাইছে না অনেকেই।

আলো নিভে গেল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। নিচে হলের দিকে চেয়ে আছে রবিন আর মুসা, এই সময় বলে উঠল কেউ, 'ওই, ওই যে। বাঁয়ে।'

একটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষেরই আকার, সবুজ, স্পষ্ট হয়েছে আরও। মনে হচ্ছে যেন বুড়ো ফারকোপারই সবুজ আলখেল্লা পরে দাঁড়িয়ে আছে।

'ভয় পাবেন না,' ফিসফিস করে বলল কেউ। 'দেখি কি করে।'

নীরবে অপেক্ষা করে রইল দর্শকরা।

নড়তে শুরু করল মূর্তিটা। হলের দেয়ালের ধার ঘেঁষে আস্তে আস্তে ভেসে গেল এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। কোণের কাছে গিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

'চলুন, দেখি কোথায় গেল?' বিড়বিড় করল এক দর্শক। 'পালানোর তো চেষ্টা করে না।'

'এবার ছাপ দেখা যাক,' বলে উঠল রবিন। 'ওই দেয়ালের কাছে কেউ যায়নি। দেখি, পায়ের ছাপ আছে কিনা।'

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল দুটো টর্চ। দেয়ালের নিচের মেঝেতে ফেলল আলো।

'নেই!' ভারিকণ্ঠ বলল। 'কিছু নেই ধুলোতে, কোন দাগই নেই। ওটা যা-ই হোক, বাতাসে ভেসে চলে, মাটিতে পা রাখে না!'

'শেষ না দেখে ফিরছি না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বিশালদেহী নেতা। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

হলের কোণে চলে এল সবাই, এখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে মূর্তিটা। এক পাশে দরজার পরে করিডর, শেষ মাথা গিয়ে মিশেছে আরেক ঘরের আরেকটা দরজার সঙ্গে। দুটো দরজাই খোলা। আলো ফেলে সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না।

আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার অপেক্ষায় রইল ওরা। খানিক পরেই একটা দরজায় দেখা দিল মূর্তি। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল হলের আরেক প্রান্তের দিকে। শেষ মাথায় গিয়ে থামল। তারপর ধীরে, অতি ধীরে আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল। রবিনের মনে হলো, দেয়ালে মিশে গেল ওটা।

এবারেও পায়ের ছাপ বা বালিতে কোনরকম দাগ পাওয়া গেল না।

পুলিশ ডাকতেই হলো। দলবল নিয়ে নিজেই এসে হাজির হলেন লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ-প্রধান ইয়ান ফ্লেচার। কিছুই পেল না পুলিশও। আহত কোন মানুষ কিংবা জানোয়ার, কিছু না।

grohon.com

grohon.com

পোড়-খাওয়া পুলিশ অফিসার ইয়ান ফ্লেচার, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না, ভূত দেখেছে লোকে, কিন্তু আটজন সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের কথা উড়িয়েই দেন কিভাবে? যা-ই হোক, একজন পুলিশকে পাহারায় রেখে দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি।

গভীর রাতে তাঁকে ফোন করল এক গুদামের দারোয়ান, সবুজ একটা জ্বলন্ত মূর্তিকে দেখতে পেয়েছে সে। গুদামের দরজার কাছে নড়াচড়া করছিল, সে এগোতেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে।

সে-রাতেই থানায় ফোন করল এক মহিলা। গভীর রাতে গোঙানির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় তার। একটা রহস্যময় সবুজ জ্বলজ্বলে মূর্তিকে দেখেছে সে তার বাড়ির বারান্দায়। যেই আলো জ্বেলেছে মহিলা, সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেছে মূর্তিটা। দু'জন ট্রাক-ড্রাইভার রিপোর্ট করল, তাদের গাড়ির কাছে সবুজ জ্বলন্ত মূর্তি দেখেছে।

শেষ রিপোর্ট এল পুলিশের একটা পেট্রল-কার থেকে। রেডিওতে খবর পাঠাল দুই অফিসার, রকি বীচের গ্রীন হিল গোরস্থানে একটা সবুজ মূর্তি দেখেছে ওরা। দ্রুত সেখানে এসে পৌঁছুলেন ফ্লেচার। বিরাট লোহার গেট ঠেলে ঢুকলেন গোরস্থানে। শাদা লম্বা একটা স্তম্ভে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন একটা সবুজ মূর্তিকে। তাঁকে এগোতে দেখেই যেন ধীরে ধীরে মাটিতে মিশে গেল মূর্তিটা।

টর্চ জ্বেলে দেখলেন ফ্লেচার। কিন্তু আর কিছুই চোখে পড়ল না। দ্রুত এসে দাঁড়ালেন স্তম্ভের কাছে। স্মৃতি-স্তম্ভ। মৃতের নাম, জন্ম-মৃত্যুর তারিখ আর কিভাবে মারা গেছে, লেখা রয়েছে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না অভিজ্ঞ পুলিস-প্রধান। কবরটা বুড়ো ফারকোপার কৌনের। পঞ্চাশ বছর আগে সিঁড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে যে মরেছিল।

দুই

ইইইইইইই-আআআআহ্‌হ্‌! শোনা গেল ভূতুড়ে চিৎকার, কিন্তু আঁতকে উঠল না মুসা আর রবিন, কারণ শব্দটা আসছে টেপ রেকর্ডারের স্পীকার থেকে।

লোহালক্কড় আর বাতিল মালের জঞ্জালের তলায় লুকানো মোবাইলহোমের হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। আগের রাতে রবিনের রেকর্ড করে আনা টেপটা গভীর আগ্রহে শুনছে কিশোর পাশা।

'এই শেষবার, আর চিৎকার করেনি,' বলল রবিন। 'এরপর সামান্য কিছু কথাবার্তা, লোকের। বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে সুইচ অফ করে দিয়েছিলাম, আর কিছু রেকর্ড হয়নি।'

কথাবার্তা যা যা রেকর্ড হয়েছে, গভীর মনোযোগে শুনল কিশোর। রেকর্ডিংয়ের সময় মাইক্রোফোনের ভল্যুম বাড়িয়ে দিয়েছিল রবিন, ফলে স্পষ্ট আওয়াজ, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সব। টেপ শেষ হতেই সুইচ টিপে মেশিন থামিয়ে দিল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে।

'মানুষের গলার মতই লাগল,' আনমনে বলল কিশোর। 'যেন সিঁড়ি থেকে

গড়াতে গড়াতে পড়ছে লোকটা, শেষ মাথায় পড়ে হঠাৎ থেমে গেছে। বোধহয় চেঁচানোর ক্ষমতা ছিল না আর।'

'ঠিক বলেছ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'তা-ই ঘটেছিল পঞ্চাশ বছর আগে। সিঁড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরেছিল ফারকোপার বুড়ো। পড়ার সময় নিশ্চয় ওরকমভাবে চেঁচিয়েছে।'

'এক মিনিট,' আঙুল তুলল মুসা। 'সে তো পঞ্চাশ বছর আগের কথা। এতদিন পর কেন শোনা গেল?'

'হয়তো,' হালকা গলায় বলল কিশোর, 'পঞ্চাশ বছর আগের চিৎকারটা জমেছিল বাতাসে, এতদিন পর শব্দ হয়ে বেরিয়েছে।'

'দূর, ঠাট্টা কোরো না। পঞ্চাশ বছর আগের শব্দ কি করে শোনা গেল?'

'জানি না। রবিন, খোঁজখবর নিশ্চয় করেছ। শোনাও তো কৌন প্রাসাদের ইতিহাস,' প্রাসাদ শব্দটা বাংলায় বলল কিশোর।

'প্রাসাদ?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বাংলা। বড় বড় বাড়িকে বলে। হ্যাঁ, বলো, কৌন ম্যানশন সম্পর্কে কি কি জানলে?'

লম্বা দম নিল রবিন, তারপর শুরু করল, 'বাড়িটা ভেঙে ফেলা হচ্ছে শুনে গতকাল মুসাকে নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, পুরানো বাড়ির ওপর ভাল একটা ফিচার করে স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপতে দেব। সেজন্যেই টেপরেকর্ডার নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে, যা যা দেখব, খুঁটিনাটি সব রেকর্ড করে রাখব, পরে লেখার সুবিধে হবে ভেবে।

'চাঁদের আলোয় কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল বাড়িটা। ঢোকার পর বড় জোর পাঁচ মিনিট কাটল, তারপরই শোনা গেল প্রথম চিৎকার। মাইক্রোফোনের ভল্যুম বাড়িয়ে দিলাম। তুমি আগ্রহ দেখাবে জানতাম।'

'খুব ভাল করেছ,' বলল কিশোর। 'এতদিনে সত্যিকার গোয়েন্দার মত ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ করেছ। টেপে শুনেই বাড়িটা কত বড়, আশেপাশে আগাছার জঙ্গল কেমন, বুঝে গেছি। লোকের কথাবার্তাও শুনেছি। ওসব আর বলার দরকার নেই, বাড়ির ভেতরে ঢোকার পর কি কি ঘটল, বলো।'

বিস্তারিত জানাল সব রবিন, কিভাবে বাড়িতে ঢুকে ঘরের পর ঘর খুঁজেছে, কোথায় কিভাবে উদয় হয়েছে সবুজ ভূত, গায়েব হয়ে গেছে, সব।

'এবং ভূতের পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি,' যোগ করল মুসা। 'রবিনের মনেই প্রথম প্রশ্নটা জেগেছিল। বলতেই টর্চ নিয়ে খোঁজা শুরু করল সবাই।'

'ভাল,' বলল কিশোর। 'তা কতজন লোক সবুজ জিনিসটাকে দেখেছে, মানে, তোমাদের সঙ্গে ক'জন ছিল?'

'ছ'জন,' জানাল মুসা।

'না, সাত,' হাত নাড়ল রবিন।

চোখে চোখে তাকাল দু'জন।

'ছয়,' আবার বলল মুসা, 'আমি শিওর। বিশালদেহী নেতা, ভারিকণ্ঠ, কুকুরের

grohon.com

মালিক, মোটা লেন্সের চশমা পরা লোকটা, আর, আর দু'জন, তাদের দিকে ভালমত খেয়াল দিইনি।'

'কি জানি,' নিশ্চিত হতে পারছে না রবিন। 'তিনবার গুণেছি আমি। একবার গুণেছি ছয়জন, আর দু'বার সাতজন।'

'কতজন, সেটা বড় কথা না,' নিজের নীতিবাক্য নিজেই ভুলে গেল কিশোর—রহস্যভেদের কাজে কোন ব্যাপারকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়; সে যত তুচ্ছই হোক। 'যাক, বাড়ির ইতিহাস বলো এখন।'

'বলছি,' শার্টের গলার কাছের একটা বোতাম খুলে দিল রবিন। 'আজকের কাগজে বাড়িটার সম্পর্কে অনেক কথা ছাপা হয়েছে। লাইব্রেরিতে কোন বইয়ে কিছু পাইনি। কৌন ম্যানশন অনেক আগে তৈরি হয়েছে। রকি বীচে শহর গড়ে ওঠারও অনেক আগে।

'খবরের কাগজে লিখেছে, আশি-নব্বই বছর আগে বুড়ো ফারকোপার তৈরি করেছিল বাড়িটা। চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, নিশ্চয় খুব ঘোড়েল লোক ছিল। ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি, তবে যতটা জানা গেছে, চীনে নাকি কি এক গোলমাল পাকিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল এক অপরূপ সুন্দরী চীনা-রাজকুমারীকে। শোনা যায়, প্রথমে এসে উঠেছিল স্যান ফ্রানসিসকোয়, ভাইয়ের বাড়িতে। ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় রাগ করে চলে এসেছিল এই রকি বীচে।

'কেউ কেউ বলে, আসলে চীন-রাজবংশের উচ্চপদস্থ কারও সঙ্গে লেগেছিল ফারকোপার কৌন, হয়তো স্ত্রীর ভাই বা বাপ, বা ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে, সেই লোক নাকি প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। তাই রকি বীচে এসে বাড়ি করে লুকিয়েছিল বুড়ো। জানো তো, এদিকটায় তখন বসতি গড়ে ওঠেনি, বুনোই ছিল।

'কৌন ম্যানশনে বেশ রাজকীয় হালে বাস করেছে ফারকোপার। এক গাদা চাকর-বাকর ছিল। চীনের মানচু রাজবংশের লোকের মত আলখেল্লা পরতে পছন্দ করত সে, তার প্রিয় রঙ ছিল সবুজ। খাবার আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে আনিয়ে নিত ওয়াগনে করে, হপ্তায় একবার। একদিন এসে বাড়িটা খালি পেল ওয়াগনের ড্রাইভার। শুধু হলের সিঁড়ির গোড়ায় পড়েছিল বুড়ো ফারকোপারের লাশ। ঘাড় ভাঙা।

'পুলিশ এল। তাদের সন্দেহ, অতিরিক্ত মদ খেয়ে সামলাতে না পেরে সিঁড়ি থেকে পড়ে মরেছে বুড়ো। ভয়ে পালিয়েছে চাকর-বাকরেরা। এমনকি বুড়োর বৌ-ও।

'অনেক খোঁজ-খবর করল পুলিশ, কিন্তু এমন কাউকে পেল না যে কিছু জানাতে পারে। এমনিতেই চীনারা বাইরের লোকের কাছে গোপন কথা ফাঁস করে না, তখনকার দিনে আরও বেশি মুখ বুজে থাকত। কাছেপিঠে যে কয়েকজন চীনা ছিল, তাদের মুখ থেকে একটা শব্দও বের করতে পারেনি পুলিশ। বুড়োর চাকরদের কাউকে পায়নি। হয় চীনে পালিয়ে গিয়েছিল, নয়ত লস অ্যাঞ্জেলেসের চায়না টাউনে গিয়ে দেশোয়ালী ভাইদের মাঝে লুকিয়েছিল।

'যা-ই হোক, পুরো ব্যাপারটা একটা রহস্য। জানামতে বুড়োর একমাত্র আত্মীয় তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী, আইনত তিনিই পেলেন বাড়িটা। ভারড্যান্ট ভ্যালিতে আঙুরের খেত ছিল তাঁর। কৌন ম্যানশন বিক্রির প্রস্তাব পেয়েছেন মহিলা অনেকবার, কিন্তু বিক্রি করতে রাজি হননি। বাড়িটায় এসে থাকেনওনি কোনদিন। তিনি মারা যাওয়ার পরেও ঠিক একই রকমভাবে পড়ে থাকল বাড়িটা, পড়ে পড়ে নষ্ট হলো। তারপর, এই এ-বছর মহিলার মেয়ে, মিস দিনারা কৌন বিলডিং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর কাছে বাড়িটা বিক্রি করতে রাজি হয়েছেন। তারাই গতকাল থেকে বাড়ি ভাঙা শুরু করেছে, নতুন বাড়ি তুলবে। ব্যস, এই জানি।'

'হুঁ,' সোজা হয়ে বসল কিশোর। 'কাগজগুলো দেখা যাক এবার।'

কয়েকটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে এক এক করে টেবিলে বিছাল গোয়েন্দাপ্রধান। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা আর স্যান ফ্রানসিসকোর একটা কাগজেও খবরটা ছাপা হয়েছে, স্থানীয়গুলোতে তো হয়েছেই—বড় বড় হেডলাইন দিয়ে। লিখেছেও অনেক জায়গা নিয়ে। কেউ হেডিং দিয়েছে : 'চেঁচানো ভূতের ভাঙা বাড়ি পরিত্যাগ, রকি বীচে আতঙ্ক'; কেউ 'পোড়ো বাড়ি ভাঙা শুরু, রকি বীচে সবুজ ভূতের উৎপাত'; কেউ বা আবার লিখেছে, 'পুরানো আস্তানা ধ্বংসপ্রাপ্ত, নতুন আস্তানার খোঁজে বেরিয়েছে সবুজ ভূত'।

যার যা কলমের মাথায় এসেছে লিখেছে, বানানো, রঙ চড়ানো; নানাজনের নানা মন্তব্য খুব রস দিয়ে সাজিয়েছে। তবে, আসল তথ্য সব কাগজেই প্রায় এক, রবিন একটু আগে যা বলেছে। যারা যারা ভূত দেখেছে, তাদের কথাও লেখা হয়েছে, বাদ পড়েছে শুধু পুলিশ-প্রধান ইয়ান ফ্লেচার আর তার দুই সহকারী অফিসারের কথা। ইচ্ছে করেই খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে নিজেদের কথা চেপে গেছে তারা, হাসির পাত্র হতে চায়নি।

'রকি বীচ নিউজ' কাগজটায় হাত রেখে বলল কিশোর, 'এতে লিখেছে, একটা গুদামের বাইরেও দেখা গেছে ভূতটাকে, তারপর এক মহিলার বাড়ির বারান্দায়, এরপর দেখেছে দু'জন ট্রাক-ড্রাইভার। পুরানো একটা হোটেলে তখন খাচ্ছিল ড্রাইভাররা, এই সময়ই বাইরে ট্রাকের কাছে ভূতটাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে তারা। তারমানে, বোঝাতে চাইছে, পুরানো আস্তানা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ভূতটা, নতুন আস্তানার খোঁজে আছে।'

'হ্যাঁ,' খুব জোর দিয়ে বলল মুসা, 'এমনও হতে পারে, রকি বীচ থেকে চলে যাওয়ার তালে আছে সে, ট্রাকে চড়ে, তাই ট্রাকের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল।'

'ভূত তো এমনিতেই যেখানে খুশি যেতে পারে, চোখের পলকে, তার যানবাহনের দরকার হবে কেন?'

'আমি কি জানি?' দু'হাত উল্টাল মুসা।

হাসল কিশোর। 'যা-ই হোক, খুব রহস্যময় কাণ্ড। আরও তথ্য না পেলে, কিংবা নতুন কিছু না ঘটলে...' বাধা পেয়ে থেমে গেল সে।

বাইরে থেকে ডাকছেন মেরিচাচী। 'রবিন, এই রবিন, জলদি এসো।'

grohon.com

তিন

রবিনের বাবা হঠাৎ করে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে?

তাড়াহুড়ো করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা।

দুই সুড়ঙ্গ মানে, একটা লম্বা লোহার মোটা পাইপ। এক মুখ কায়দা করে যোগ করে দেয়া হয়েছে মোবাইল—হোমের মেঝের একটা গর্তের সঙ্গে। আরেক মুখ জঞ্জালের বাইরে, একটা লোহার পাত ফেলে সেটা ঢেকে রাখা হয় সারাক্ষণ। হামাগুড়ি দিয়ে চলাচল করতে যাতে অসুবিধে না হয়, সেজন্যে পুরু কার্পেট পেতে দেয়া হয়েছে পাইপের ভেতরে।

বাইরে বেরোল তিন গোয়েন্দা। জঞ্জালের বেড়ার পাশ দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে এল স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাচে-ঢাকা ছোট্ট অফিসঘরের সামনের আঙিনায়।

অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে লম্বা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন মেরিচাচী। বাদামী গোঁফে আঙুল বুলিয়ে উজ্জ্বল চোখের তারা নাচিয়ে বললেন ভদ্রলোক, 'এই যে, এসে গেছে আপনার তিন আসামী। রবিন, তোমার সঙ্গে ফ্লেচার কথা বলতে চায়। মুসা, তোমার সঙ্গেও।'

ঢোক গিলল মুসা। পুলিশ-প্রধান তার সঙ্গে কথা বলতে চান? আগের রাতে যা যা দেখেছে-শুনেছে, দ্রুত গুছিয়ে নিতে শুরু করল মনে।

ঝাঁকড়া চুলে আঙুল বোলাল কিশোর। 'আংকেল, আমি আসব?'

'এসো,' হাসলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এসো, বাইরে গাড়িতে বসে আছে চীফ।'

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো সিডান। স্টিয়ারিং হুইলে এক হাত রেখে বসে আছেন ইয়ান ফ্লেচার। মোটাসোটা মানুষ, মাথার সামনের দিকটায় টাক, হাসিখুশি। ববের বাবার দিকে চেয়ে হাসলেন। 'বাড়িতেই পেয়েছ তাহলে। এসো, গাড়িতে ওঠো। দেখো রজার, আগে থেকেই বলে দিচ্ছি, আমাকে বাঁচাবে জোঁকগুলোর হাত থেকে। আরিব্বাপরে বাপ! রিপোর্টার তো না একেককটা···এসো, গাড়িতে ওঠো।'

'আমিও তো খবরের কাগজের লোক,' গাড়িতে উঠে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'সেজন্যেই তো বলছি। তুমি আমার প্রতিবেশী, সহায়তা করবে আর কি একটু। যেভাবে প্রশ্ন শুরু করে ওরা, মুখ ফসকে কি বলতে কি বলে ফেলি, দেবে ছেপে। যাবে আমার এত বছরের ক্যারিয়ার।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, ভেব না,' হাত তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এক কাজ করি। কৌন ম্যানশনে যেতে যেতেই শুনি ওরা কি কি দেখেছে।'

'আরও কয়েকজনের মুখে শুনেছি অবশ্য,' ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে বললেন ফ্লেচার, 'তবু আরেকবার শোনা যাক। বলো তোমরা।'

সংক্ষেপে সব বলল রবিন, মাঝে মাঝে কথা যোগ করল মুসা। চুপচাপ গাড়ি চালাতে চালাতে শুনলেন পুলিশ-প্রধান। তারপর বললেন, 'অন্যেরাও এই একই

কথা বলেছে। অনেকেই দেখেছে। তবু বিশ্বাস করতাম না, যদি···' থেমে গেলেন ফ্লেচার, আরেকটু হলেই দিয়েছিলেন ফাঁস করে।

'যদি?' সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'না, কিছু না।'

'কিছু তো বটেই। ইয়ান, কিছু লুকোচ্ছ তুমি। ভূতটাকে তুমিও দেখেছ, না? এ-কারণেই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিচ্ছ না।'

'হ্যাঁ,' পথের দিকে তাকিয়ে আছেন ফ্লেচার, 'আমি দেখেছি। গোরস্থানে। ফারকোপার কৌনের কবরের কাছে, মারবেলের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি এগোতেই মিশে গেল মাটিতে, যেন কবরে ঢুকে পড়ল।'

পিঠ খাড়া হয়ে গেছে তিন কিশোরের।

আড়চোখে ফ্লেচারের দিকে তাকালেন মিস্টার মিলফোর্ড, মুচকে হাসলেন, 'নোট করে নেব?'

'না না,' আঁতকে উঠলেন ফ্লেচার, ছেলেদের দিকে ফিরলেন। 'এই, কাউকে কিছু বলবে না। তোমরা আছ ভুলেই গিয়েছিলাম। বলবে না তো?'

'না, স্যার, বলব না,' কিশোর মাথা নাড়ল।

'আমি একা নই,' চীফ নিশ্চিন্ত হলেন কিনা বোঝা গেল না, 'আরও অনেকেই দেখেছে, নিশ্চয় কাগজ পড়েছ। দু'জন ট্রাক-ড্রাইভার দেখেছে। এক মহিলা দেখেছে। এক গুদামের দারোয়ান দেখেছে। আমি দেখেছি, আমার দু'জন অফিসার দেখেছে, রবিন আর মুসা দেখেছে।'

'মোট ন'জন,' হিসাব করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'না, পনেরো,' শুধরে দিলেন ফ্লেচার। 'আরও ছ'জন ছিল রবিন আর মুসার সঙ্গে। মোট পনেরো জন দেখেছে ভূতুড়ে মূর্তিটাকে।'

'ছ'জনই ছিল, ঠিক জানেন?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'নাকি সাতজন? মুসা আর রবিন একমত হতে পারছে না।'

'আমি শিওর না। চারজনের রিপোর্ট শুনেছি আমরা। তিনজন বলেছে, তোমরা ছাড়া আরও ছ'জন ছিল। একজন বলেছে সাতজন। অন্য দুই বা তিন, যে-ক'জনই হোক, ওদের রিপোর্ট নেয়া হয়নি। ওরাও আসেনি। বোধহয় পাবলিসিটি চায় না। পনেরো হোক আর ষোলোই হোক, এতগুলো লোক দেখেছে, চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। নিজের চোখে দেখলাম, মাটিতে মিলিয়ে গেল, অবিশ্বাস করি কি করে?'

অযত্নে গজিয়ে ওঠা ঘাসে-ঢাকা ড্রাইভওয়েতে ঢুকল গাড়ি। দিনের আলোয় চমৎকার লাগছে বাড়িটাকে, একটা অংশ ভাঙা অবস্থাতেও। সদর দরজায় পাহারা দিচ্ছে দু'জন পুলিশ। বাদামী স্যুট পরা এক লোক অস্থির ভাবে পায়চারি করছে ওদের সামনে। গাড়িটাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল।

'কে?' বিড়বিড় করল ফ্লেচার। 'আরেকটা জোঁক বোধহয়।'

এগিয়ে এল লোকটা। 'চীফ ফ্লেচার?' খুব মিষ্টি কণ্ঠ। 'আপনি পুলিশ চীফ তো? আপনার অপেক্ষায়ই আছি। আমার মক্কেলের বাড়িতে আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে

না কেন আপনার লোক?'

'আপনার মক্কেল?' ভুরু কুঁচকে গেল পুলিশ-প্রধানের। 'কে আপনি?'

'আমি ডলফ টার্নার,' পরিচয় দিল লোকটা। এ-বাড়ি মিস দিনারা কৌনের, আমি তার উকিল, দূর সম্পর্কের ভাইয়ের ছেলে। তার ভালমন্দ দেখাশোনার ভার আমার ওপর। সকালে খবরের কাগজ পড়েই ছুটেছি, স্যান ফ্রানসিসকো থেকে উড়ে এসেছি। আমি ভালমত তদন্ত করতে চাই। পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার কাছে, পাগলের প্রলাপ।'

'অবিশ্বাস্য, ঠিক,' মাথা দোলালেন ফ্লেচার, 'তবে পাগলের প্রলাপ নয়। যাক, আপনি এসেছেন, খুশি হলাম মিস্টার টার্নার। নইলে আসার জন্যে খবর পাঠাতে হত হয়তো। ও হ্যাঁ, পাহারা রেখেছি, কারণ, যখন-তখন যে কেউ ঢুকে পড়তে পারে। আমার নির্দেশ আছে, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়া হয়। তাই আপনাকে ঢুকতে দেয়নি। চলুন, এখন ঢুকি। এই যে, এই ছেলেরাও গতরাতে এসেছিল এখানে, সবুজ মূর্তিটাকে দেখেছে। এজন্যেই এখন নিয়ে এসেছি। কোথায় কোথায় দেখা গেছে, দেখাবে আমাদের।'

তিন কিশোর আর মিস্টার মিলফোর্ডের সঙ্গে টার্নারের পরিচয় করিয়ে দিলেন ফ্লেচার। তারপর সদর দরজার দিকে রওনা হলেন। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল প্রহরীরা। বিরাট হলে ঢুকলেন তিনি, সঙ্গে অন্য পাঁচজন। আবছা আলো হলে, গা ছমছমে পরিবেশ। রবিন আর মুসা দেখাল, ঠিক কোথায় প্রথম উদয় হয়েছিল মূর্তিটা।

মুসা ওদেরকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল। 'এই সিঁড়ির ওপর দিয়ে ভেসে হলে নেমেছিল মূর্তিটা,' জানাল সে।

'ভেসে বলছ কেন?' প্রশ্ন করলেন পুলিশ-প্রধান।

'মাটিতে পায়ের ছাপ দেখা যায়নি, সবাই খুঁজেছি। উড়ে না নামলে কি করে নামল? ছাপ খোঁজার কথা রবিনের মনে হয়েছিল। সবাই খুঁজেছি, কিন্তু ছাপ-টাপ দেখিনি।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'উড়ে হলের ওই যে, ওখানটায় চলে গেল,' হাত তুলে দেখাল মুসা, 'দেয়ালের কাছে। এক সময় দেয়ালের ভেতর দিয়ে ঢুকে মিলিয়ে গেল।'

'আঁম্‌ম্‌ন,' ভ্রূকুটি করলেন ফ্লেচার, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে উকিল। 'বুঝতে পারছি না কিছু? ভূতুড়ে বাড়ির কিস্‌সা অনেক শুনেছি। আমার বিশ্বাস হয় না ওসব।'

'কি বিশ্বাস হয়?' ভুরু নাচালেন ফ্লেচার। 'কি ছিল বলে আপনার ধারণা?'

চোখ মিটমিট করল উকিল। 'আমি কি করে জানব?'

'সেটা জানার জন্যেই এসেছি আমরা। আপনি আসাতে কেন খুশি হয়েছি, জানেন?'

'কেন?'

'আজ সকালে মইয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির এক জায়গায় প্লাস্টার ভাঙছিল এক শ্রমিক। এই যে, আমরা যেখানে রয়েছি, তার নিচের তলারই একটা সাইড। কিছু একটা দেখে কাজ থামিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে।'

'কী?' সামনে ঝুঁকে এল টার্নার। 'কি দেখলে?'

'ও শিওর না। তবে ওই যে দেয়ালটা,' যেটা গলে ভূত অদৃশ্য হয়েছে বলেছে মুসা, সেদিকে দেখিয়ে বললেন ফ্লেচার, 'লোকটার ধারণা, ওটার ওপাশে। একটা গোপন কুঠুরিমত আছে। আপনার অনুমতি পেলে ভেঙে ঢুকতে পারি আমরা।'

কপাল ডলল টার্নার। মিস্টার মিলফোর্ডের দিকে তাকাল, তিনি তখন নোটবইয়ে নোট লিখতে ব্যস্ত। 'গোপন কুঠুরি?' রীতিমত অবাক হয়েছে উকিল। 'কই, এ বাড়িতে তেমন কোন কুঠুরি আছে বলে তো শুনিনি।'

প্রচণ্ড উত্তেজনা কোনমতে দমিয়ে রেখেছে তিন কিশোর।

উকিলের অনুমতি পেয়ে কুড়াল আর শাবল নিয়ে এল দুই পুলিশ।

দেয়ালের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন ফ্লেচার, 'ভাঙো।'

প্রচণ্ড বিক্রমে দেয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ দু'জন। একটা ফোকর করে ফেলল। বোঝা গেল, ওপাশে ফাঁপা জায়গা রয়েছে, অন্ধকার, দেখা যায় না কি আছে। আরও বড় করা হলো ফোকর, মানুষ ঢুকতে পারবে। হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেললেন ফ্লেচার।

অস্ফুট স্বরে কিছু বললেন, তারপর ফোকর গলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। ঢুকবে কিনা দ্বিধা করছে উকিল, কিন্তু ফ্লেচারের পেছনে মিস্টার মিলফোর্ডকে যেতে দেখে সে-ও ঢুকল। বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের উত্তেজিত কথা শুনতে পেল তিন গোয়েন্দা।

ফোকর দিয়ে উঁকি দিল কিশোর, তারপর দুই সহকারীর দিকে একবার চেয়ে সে-ও ঢুকে পড়ল। মুসা আর রবিনও ঢুকল।

ছোট একটা কক্ষ, ছয় বাই আট ফুট। দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে আলো আসছে, আস্তর খসানোর সময়ই নিশ্চয় ফেটেছে।

ঘরে আর কিছু নেই, শুধু একটা কফিন।

চকচকে পালিশ করা নিচু কাঠের টেবিলে রাখা আছে কফিনটা, জায়গায় জায়গায় চমৎকার খোদাইয়ের কাজ। ডালা তোলা। ভেতরের কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ফ্লেচার আর অন্য দু'জনের।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ছেলেরাও উঁকি দিল কফিনের ভেতরে। চমকে উঠল।

একটা কঙ্কাল। পুরোটা দেখা যাচ্ছে না। দামী আলখেল্লায় ঢেকে আছে। এক সময় খুব সুন্দর ছিল কাপড়টা, এখন অনেক জায়গায় নষ্ট হয়েছে দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে থেকে।

সবাই নীরব। অবশেষে কথা বললেন মিস্টার মিলফোর্ড, 'দেখো, প্লেটটা দেখো!' কফিনের গায়ে আটকানো রূপার একটা পাত দেখালেন। তাতে ইংরেজিতে লেখা : ফারকোপার কৌনের প্রিয় স্ত্রী শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন এখানে।

'ফারকোপারের চীনা স্ত্রী।' খসখসে শোনাল চীফের কণ্ঠ।

'অথচ লোকে ভেবেছে, বুড়ো মারা যাওয়ার পর চীনে পালিয়েছে মহিলা,' বিড়বিড় করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'লোকের কথা। দেখুন দেখুন,' কফিনের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল উকিল।
জিনিসটা বের করে আনল টার্নার। একটা মালা। গোল গোল পাথরের মত কিছু দিয়ে তৈরি হয়েছে। টর্চের আলোয় ভোঁতা ধূসর আভা বিকিরণ করছে।
'এটাই বোধহয় সেই বিখ্যাত গোস্ট পার্লস,' বলল উকিল। 'আমাদের পারিবারিক অলংকার, চীন থেকে নিয়ে এসেছিল মিস্টার ফারকোপার কৌন। অনেক দামী জিনিস। মিস্টার কৌন ঘাড় ভেঙে মরল, তার স্ত্রী নিখোঁজ হয়ে গেল। আমরা ভেবেছিলাম, হারটা নিয়ে আবার দেশে ফিরে যাওয়ার পথে কোনভাবে লাপাত্তা হয়ে গেছে মহিলা। অথচ এখানে, এই বাড়িতেই ছিল এতগুলো বছর!'

চার

হেডকোয়ার্টারে কাজে ব্যস্ত মুসা আর রবিন। সবুজ ভূত সম্পর্কে খবরের কাগজে যা যা লেখা বেরিয়েছে, সবগুলোর কাটিং কেটে দিচ্ছে মুসা, আঠা দিয়ে বড় একটা খাতায় সেগুলো সেঁটে রাখছে রবিন।
সবুজ ভূত সম্পর্কে লোকের আগ্রহ কমে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ করে পোড়ো বাড়িতে গোপন কুঠুরি, কফিনের ভেতরে বুড়ো ফারকোপারের চীনা স্ত্রীর মৃতদেহ আর মুক্তোর মালা আবার নতুন করে সাড়া জাগাল রকি বীচের লোকের মনে। প্রথম পাতায় বড় বড় হেডিং দিয়ে ছাপা হলো সেই খবর।
ফারকোপার কৌনের অতীত ইতিহাস আরও গভীরে খুঁড়ে বের করার জন্যে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল রিপোর্টারেরা। জানা গেল, চীনা জাহাজে ক্যাপ্টেনের চাকরি করেছে কিছু দিন ফারকোপার। দুর্ধর্ষ নাবিক নাকি ছিল সে, ভয়াবহ ঝড়কেও পরোয়া করত না, জাহাজ নিয়ে ঢুকে পড়ত ঝড়ের মাঝে। বেশ কয়েকজন মানচু রাজবংশীয় ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তার, প্রায়ই নানারকম মূল্যবান জিনিস তাকে উপহার দিত তারা। তবে গোস্ট পার্ল তাকে উপহার দেয়া হয়নি, ওটা সে চুরি করেছে, তারপর তাড়াহুড়ো করে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছে, আর কোনদিন চীনে যাওয়ার আশা ত্যাগ করে। তারপর, বাকি জীবনটা কৌন ম্যানশনে লুকিয়ে কাটিয়েছে।
'ভাবো একবার,' হাত থামিয়ে বলে উঠল হঠাৎ রবিন, 'এমন একটা লোক এই রকি বীচেই ছিল এতদিন, আর কি কাণ্ডটাই না ঘটাল। বাবা আর চীফ কি ভাবছে জানো?'
ধাতব শব্দ হতেই থেমে গেল রবিন। দুই সুড়ঙ্গের মুখের লোহার পাত সরানোর আওয়াজ। চাপা খসখস শব্দ হলো কিছুক্ষণ, তারপর ট্রেলারের মেঝেতে লাগানো ট্র্যাপডোরে টোকা পড়ল।
দরজার হুড়কো সরিয়ে দিল মুসা।
গর্তের মুখে বেরিয়ে এল কিশোরের মাথা। 'হুফ্‌ফ্‌!' মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল সে, উঠে এল। যা গরম পড়েছে। ...ভাবছি।'
'সাবধান, কিশোর,' হেসে বলল মুসা, 'ভাবাভাবিটা এখন একটু কমাও। নইলে মগজের বেয়ারিং জ্বলে গিয়ে শেষে আমাদের মতই ভোঁতামাথাদের একজন হয়ে যাবে।'
শব্দ করে হাসল রবিন।
কিশোরের মগজ সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা মুসার, কিন্তু সুযোগ পেলেই সেটা নিয়ে বন্ধুকে খোঁচা মারতেও ছাড়ে না সে। কিন্তু সাবধানী ছেলে কিশোর, এড়িয়ে যায়। মেজাজ শান্ত রাখার ক্ষমতা তার অপরিসীম।
মুসার কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, এমনি ভঙ্গিতে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল তার সুইভেল চেয়ারে। 'ভাবছি,' আবার বলল সে। 'ভাবায় লাভও হচ্ছে অবশ্য। অনেক-বছর আগে কৌন ম্যানশনে কি ঘটেছিল, অনুমান করতে পারছি।'
'তোমার কষ্ট না করলেও চলত, কিশোর,' রবিন বলল। 'বাবা আর চীফও এ-নিয়ে অনেক ভেবেছেন...'
'আমার ধারণা,' রবিনের কথা কানে তুলল না কিশোর।
'বাবা আর চীফের ধারণা,' কিশোরকে কথা শেষ করতে দিল না রবিন। সে যা যা জানে, সেটা তার আগেই কিশোর বলে ফেলুক, এটা হতে দিল না। 'রোগে ভুগে মারা গেছে ফারকোপারের স্ত্রী। সুন্দর একটা কফিনে ভরে তাকে তখন বাড়িরই ছোট্ট একটা ঘরে রেখে দিল বুড়ো নাবিক, প্রিয়তমা স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে দিতে মন সায় দেয়নি হয়তো, মৃত্যুর পরও তাই কাছে কাছে রেখেছে। সম্ভবত করিডর দিয়ে কফিনটা সেই ঘরে ঢুকিয়েছে বুড়ো, তারপর জানালা দরজা ভেঙে ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছে কোকর। তার ওপর প্লাস্টার করে দিয়েছে। বাইরে থেকে দেখে আর বোঝার উপায় ছিল না, একটা গোপন কুঠুরি আছে ওখানে।
'তারপর কতদিন বেঁচে ছিল ফারকোপার, জানা যায়নি। এক রাতে সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে পড়ে মরল সে।
'চাকরেরা বুড়োর লাশ দেখে ভয়ে রাতেই পালাল। স্যান ফ্রানসিসকোর চীনা-পল্লীতে ঠাঁই নিয়েছিল, না দেশে পালিয়েছিল, জানা যায়নি। কারণ, স্বদেশীদের ব্যাপারে আমেরিকান পুলিশের কাছে মুখ খোলেনি চীনা-পল্লীর চীনারা।
'যতদূর জানা যায়, আত্মীয় বলতে একজনই ছিল ফারকোপারের, তার ভাইয়ের স্ত্রী। স্যান ফ্রানসিসকোর ভারড্যান্ট ভ্যালিতে আঙুরখেত...'
'এসব পুরানো কথা,' হাত তুলল কিশোর, 'জানি।'
'শেষ পর্যন্ত শোনোই না,' বলে চলল রবিন। 'এত কাছেই থাকে, অথচ মহিলা কোন দিন ফারকোপারের বাড়িতে আসেনি। তার মেয়ে দিনারা কৌনও না। মায়ের মৃত্যুর পর আঙুরের খেত আর কৌন ম্যানশনের মালিক হয়েছে মেয়ে।
'পুরানো বাড়িটাকে এতদিন কেন বিক্রি করেনি ওরা, সেটা এক রহস্য। কেন এভাবে ফেলে রেখেছিল, সেটাও। এই এতদিন পরে বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয়েছে মিস দিনারা কৌন।'
'তারপর,' মুসা যোগ করল, 'বাড়ি ভাঙা শুরু হতেই বিরক্ত হয়ে উঠল সবুজ ভূত। গোপন কুঠুরি থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে সাবধান করল। ভূত অবশ্য বুঝতে পেরেছে, যত যা-ই করুক, ওই বাড়িতে আর থাকতে পারবে না সে, তাই নতুন আস্তানার খোঁজে বেরিয়েছে।'

grohon.com

grohon.com

'তোমার তাই ধারণা,' কিশোর বলল। 'ওটা ফারকোপার বুড়োর ভূত, এতেও নিশ্চয় কোন সন্দেহ নেই।'

'তোমার আছে? ওটা যদি ভূত না হয়, আমার নাম বদলে রাখব।'

'নামটা শেষে সত্যিই না বদলাতে হয়···'

কিশোরের কথায় বাধা দিল রবিন। 'তোমার কি মনে হয়, ভূত না ওটা? অন্য কিছু ভেবে থাকলে গিয়ে বলো চীফকে, হয়তো পুরস্কার দিয়ে দেবেন।'

'মানে?' চোখ মিটমিট করল কিশোর।

'কেন, কাল শোনোনি? সবার সামনেই তো চীফ বলেছেন, ভূতটাকে তিনিও দেখেছেন। পরে বাবাকে বলেছেন, ভূতে বিশ্বাস করেন না তিনি, কিন্তু এই ব্যাপারটাকে অবিশ্বাসও করতে পারছেন না। তাই জোর গলায় হুকুম দিতে পারছেন না সহকারীদের যে, সবুজ জিনিসটাকে ধরে এনে দাও। এখন যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে ওটা ভূত নয়, তাকে পুরস্কার দেবেন না?'

'হুমম,' মাথা দোলাল কিশোর, খুশি মনে হচ্ছে তাকে। 'তাহলে সবুজ ভূতের কেসটা নিতে পারি আমরা, অন্তত পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করার জন্যে হলেও। যত সহজ ভাবছ, ব্যাপারটা তত সহজ না-ও হতে পারে। এর পেছনে অনেক গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে, আমি শিওর।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল মুসা। 'পুলিশ আমাদের সাহায্য চায়নি, এক নম্বর। দুই নম্বর, ওই ভূতপ্রেতের ব্যাপারে নাক গলাতে ব্যক্তিগতভাবে আপত্তি আছে আমার।'

রব আপত্তি করল না, চুপ করে রইল।

'কেন, আপত্তি কেন?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'তিন গোয়েন্দার নীতিই তো হলো, যে-কোন জটিল রহস্য সমাধানের চেষ্টা করা। ভূতরহস্য কি রহস্য নয়? ভূত বিশ্বাস করি না মোটেও, কিন্তু যদি সত্যিই থেকে থাকে, আর একটাকে পাকড়াও করতে পারি, কি রকম সাড়া পড়বে, ভেবেছ?' রবিন আর মুসার দিকে তাকিয়ে নিল একবার করে। 'হ্যাঁ, গোড়া থেকে শুরু করি। গতরাতে আবার দেখা গিয়েছিল ভূত?'

'কাগজে তো কিছু লেখেনি,' বলল রবিন। 'চীফকে জিজ্ঞেস করেছিল বাবা। চীফ জানিয়েছেন, নতুন কোন রিপোর্ট আসেনি থানায়।'

'সে-রাতে কৌন ম্যানশনে যে ক'জন ভূতটাকে দেখেছে, সবার সঙ্গে কথা বলেছেন তোমার বাবা?'

'নাহ্। চারজনের সঙ্গে বলেছে। বিশালদেহী লোকটা, কুকুরের মালিক, আর কৌনের দুই প্রতিবেশী।'

'বাকি দু'জন?'

'কারা ছিল, সেটাই জানা যায়নি। বাবার ধারণা, ওরা পাবলিসিটি চায় না, বন্ধুদের হাসির খোরাক হতে নারাজ। আমি শিওর, দু'জন নয়, তিনজনই।'

'ঠিক আছে, ধরে নিলাম সাত জনই। কৌন ম্যানশনে আসার সাধ জেগেছিল কেন হঠাৎ?'

'জ্যোৎস্নায় হাঁটাহাঁটি করছিল ফারকোপারের প্রতিবেশীরা, এই সময় দু'জন লোক এসে তাদেরকে প্রস্তাব দিল, চাঁদের আলোয় ভাঙা পোড়ো বাড়ি কেমন লাগে, দেখতে যাওয়ার। লোকগুলোকে চেনে না প্রতিবেশীরা। তবে প্রস্তাবটা তাদের মনে ধরল। ড্রাইভওয়েতে ঢুকেই চিৎকার শুনতে পেল ওরা। তারপর কি হয়েছে, সব জানো।'

'বাড়ি ভাঙা বন্ধ হয়েছে?'

'আপাতত। গোপন আরও কুঠুরি আছে কিনা, খুঁজেছে পুলিশ। পাওয়া যায়নি। এখনও বাড়িটাকে কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছে। বাবা বলছে, ওখানে নতুন বাড়ি করলেও আর বিশেষ সুবিধে হবে না, ভাড়াটে পাওয়া মুশকিল হবে। ভূতের ভয়ে আসতে চাইবে না লোকে।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর, ধ্যানমগ্ন হয়ে রইল যেন কয়েক মিনিট, দৃষ্টি ছাতের দিকে। অবশেষে মুখ নামিয়ে রবিনকে বলল, 'টেপরেকর্ডারটা নাও, শুনি আবার ক্যাসেটটা।'

রেকর্ডারের সুইচ টিপে দিল রবিন। কানে আঘাত হানল তীক্ষ্ণ বিকট চিৎকার। তারপর লোকের কথাবার্তা। শুনতে শুনতে ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'কিছু একটা রয়েছে টেপে, ঠিক বুঝতে পারছি না, বের করে আনতে পারছি না। আচ্ছা, কুকুরের আওয়াজ যে শুনলাম, কি জাতের কুকুর?'

'কুকুরের জাত দিয়ে কি হবে?' হাত নেড়ে বলল মুসা।

'হতেও পারে। কোন কিছুকেই ছোট করে দেখা উচিত হবে না।'

'ফক্স্ টেরিয়ার,' বলল রবিন, 'রোমশ। ছোট্ট কুকুর। কিছু বুঝলে?'

বোঝেনি, বলতে বাধ্য হলো কিশোর। আবার বাজিয়ে শুনল টেপটা, আবার। কি যেন একটা ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু ধরতে পারছে না সে। টেপরেকর্ডার বন্ধ করে খবরের কাগজের কাটিং পড়ায় মন দিল।

'শহরের বাইরে চলে গেছে সবুজ ভূত,' বলল মুসা, 'এতে কোন সন্দেহ নেই। বাড়ি ভাঙা শুরু হতেই সটকে পড়েছে।'

জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। ফোন বেজে উঠেছে। রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো?'

ফোনের সঙ্গে কায়দা করে আটকানো লাউড-স্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠল। সবাই শুনতে পেল কথা। 'লঙ ডিসট্যান্স্ কল,' বলল মহিলাকণ্ঠ। 'রবিন মিলফোর্ডকে চাই।'

একে অন্যের দিকে তাকাল ছেলেরা।

'রবিন, তোমার,' বলে রিসিভার বাড়িয়ে ধরল কিশোর।

'হ্যাল্লো, রবিন মিলফোর্ড বলছি,' উত্তেজনায় গলা মৃদু কাঁপছে তার।

'হ্যাল্লো, রবিন,' বলল এক মহিলাকণ্ঠ, বৃদ্ধা, আওয়াজেই বোঝা গেল। 'আমি দিনারা কৌন। ভারড্যান্ট ভ্যালি থেকে বলছি।'

দিনারা কৌন! ফারকোপার কৌনের ভাইঝি।

'হ্যাঁ, বলুন?'

grohon.com

'আমার একটা উপকার করবে?' অনুনয় করলেন মহিলা। 'তুমি আর তোমার বন্ধু, মুসা আমান, দয়া করে আসবে একবার ভারড্যান্ট ভ্যালিতে?'

'ভারড্যান্ট ভ্যালিতে! কেন?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরী। আমার চাচাকে দেখেছ তোমরা...ইয়ে, মানে, তাঁর ভূত দেখেছ। দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে সব শুনতে চাই। ভূতটা কেমন, কি করেছে, সব...,' চুপ হয়ে গেলেন দিনারা, বোঝা যাচ্ছে, দ্বিধা করছেন। শেষে বলেই ফেললেন, 'জানো, আমি...আমিও গতরাতে দেখেছি, এই ভারড্যান্ট ভ্যালিতে। আমার ঘরে।'

পাঁচ

কিশোরের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রবিন।

'হ্যাঁ,' বলে দেয়ার জন্যে মাথা ঝুঁকিয়ে ইঙ্গিত করল কিশোর।

'হ্যাঁ নিশ্চয় আসব, মিস কৌন,' টেলিফোনে বলল রবিন। 'মুসাও আসবে হয়তো! অবশ্য যদি আমাদের বাবা-মার কোন আপত্তি না থাকে।'

'তা-তো বটেই, তা-তো বটেই,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মহিলা। 'সে-জন্যেই আগে তোমাদের বাড়িতে ফোন করেছি। তোমার মা'র আপত্তি নেই, মুসার মা-ও রাজি হয়েছেন। ভারড্যান্ট ভ্যালি খুবই সুন্দর জায়গা! বুঝেছ? আর তোমাদের বয়েসী এক নাতি আছে আমার, রিচার্ড মিঙ কৌন, তোমাদের সঙ্গ দিতে পারবে। প্রায় সারাজীবনই চীনে কাটিয়েছে।'

কিভাবে কখন যেতে হবে, বিস্তারিত জানালেন মিস কৌন। ছ'টার প্লেন ধরতে হবে রবিন আর মুসাকে, স্যান ফ্রানসিসকোয় যাবে। এয়ারপোর্টে তাদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি, গাড়িতে করে নিয়ে যাবেন ভারড্যান্ট ভ্যালির বাড়িতে। আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।

'দারুণ হলো!' আনন্দে জ্বলজ্বল করছে রবিন। 'ভাল একখান জার্নি করে আসা যাবে।' হঠাৎ মনে পড়ল তার, 'কিন্তু তোমাকে তো যেতে বলেনি, কিশোর?'

আহত হয়েছে কিশোর অবশ্যই, কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না। 'আমি ভূত দেখিনি, তোমরা দু'জন দেখেছ, তোমাদেরকেই তো বলবে। বললেও অবশ্য আমি এখন যেতে পারতাম না, জরুরী কাজ আছে। বড় ট্রাকটা নিয়ে কাল চাচা-চাচীর সঙ্গে স্যান ডিয়েগো যেতে হবে। নেভির বাতিল মালের একটা লট আছে, দেখেশুনে আনা দরকার।'

'যা-ই বলো, তোমাকে ছাড়া যেতে ভাল লাগছে না,' মুসা আন্তরিক দুঃখিত। 'আর ধারেকাছে যদি ভূত থাকে তাহলে তো কথাই নেই। তুমি ছাড়া গতি নেই আমাদের।'

মুসার কথায় মনে মনে খুশি হলো কিশোর। বলল, 'হয়তো এটা ভালই হলো। ভারড্যান্ট ভ্যালিতে ভূত দেখা গেল, তোমরা তদন্ত চালাতে পারবে। এদিকে, খোঁজখবর করে রহস্য সমাধানের চেষ্টা করব আমি। টীম ওয়ার্ক করছি আমরা, ঠিক, কিন্তু তিনজনকে একই সঙ্গে একই জায়গায় থেকে কাজ করতে হবে, এটা কোন

যুক্তি নয়। একই কাজের জন্যে দরকার পড়লে তিন জনকে তিন জায়গায় যেতে হবে না?'

অকাট্য যুক্তি, কিন্তু মুসা আর রবিনের মন খুঁত খুঁত করতেই থাকল। জোর করে ওদেরকে তুলে বাড়ি পাঠাল কিশোর, তৈরি হওয়ার জন্যে।

মুসা আর রবিনের মা সুটকেস গুছিয়েই রেখেছেন। ছেলেরা বাড়তি কিছু জিনিস নিল, একটা করে টর্চ, কিছু চক—রবিন সবুজ রঙের, মুসা নীল—দরকারের সময় দেয়ালে বা অন্য কোন জায়গায় তিন গোয়েন্দার আশ্চর্যবোধক চিহ্ন এঁকে সংকেত রাখার জন্যে।

লস অ্যাঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে তাদেরকে তুলে দিতে গেলেন রবিনের মা গাড়ি নিয়ে, সঙ্গে গেল কিশোর।

'ফোনে যোগাযোগ রাখবে আমার সঙ্গে,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'কিছু ঘটলে জানাবে। ভূতটা যদি ওখানে আবার দেখা যায়, তেমন বুঝলে আমিও চলে আসব পরে।'

বার বার ছেলেকে হুঁশিয়ার করে দিলেন রবিনের মা, 'সাবধানে থাকবে। আর দেখো, মহিলার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার কোরো না।'

'ও তো কারও সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করে না, আন্টি,' প্রতিবাদ করল কিশোর।

'জানি,' হাসলেন মিসেস মিলফোর্ড, 'তবু বলছি।'

প্লেন ছাড়ল। আকাশে উঠল বিশাল জেট, উড়ে চলল উত্তরমুখো। বেশি না, মাত্র এক ঘণ্টার ভ্রমণ, এরই মাঝে ডিনার আছে, তাই সময়টা আরও কম মনে হয়।

দেখতে দেখতে স্যান ফ্রানসিসকোয় পৌঁছে গেল বিমান, ল্যাণ্ড করল।

লাউঞ্জে মুসার বয়েসী, প্রায় তার সমান লম্বা, চওড়া কাঁধ, এক কিশোরের সঙ্গে পরিচয় হলো তাদের। এগিয়ে এসে স্বাগত জানাল, চলন-বলন-চেহারায় পাক্কা আমেরিকান ছাপ, চোখ দুটো শুধু চীনা, তা-ও পুরোপুরি নয়।

পরিচিত হলো রিচার্ড কৌন, মিঙ নামটাই তার পছন্দ, তাই ওটা ধরে ডাকতেই অনুরোধ জানাল নব পরিচিত বন্ধুদের। স্বল্প সময়েই জানিয়ে দিল, তার রক্তের চার ভাগের এক ভাগ চীনা, তবে বয়েসের চার ভাগের তিন ভাগ কাটিয়েছে চীনে, হংকং এ। মালপত্র বইতে মুসা আর রবিনকে সাহায্য করল সে, পথ দেখিয়ে বের করে নিয়ে এল বিমানবন্দর থেকে। ব্যস্ত রাস্তা পার হয়ে এসে দাঁড়াল বিরাট পার্কিং লটে।

একটা স্টেশন ওয়াগন অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে, ছোটখাট একটা বাস বললেই চলে। ড্রাইভিং সীটে বসা এক তরুণ মেকসিকান।

'হুগো,' লোকটাকে বলল মিঙ, 'এরাই আমাদের মেহমান। ও রবিন মিলফোর্ড, আর ও মুসা আমান। চলো, সোজা বাড়ি চলো। প্লেনে কি খেয়েছে না খেয়েছে, নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।'

'সি, সিনর মিঙ,' দরজা খুলে লাফিয়ে নামল হুগো। দু'হাতে দুটো ব্যাগ তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়ির পেছনের সীটে রাখল। ফিরে এসে বসল আবার ড্রাইভিং সীটে।

grohon.com

তার ঠিক পেছনেই উঠে বসল ছেলেরা, তিনজন একই সীটে পাশাপাশি। গাড়ি ছাড়ল হুগো।

স্যান ফ্রানসিসকো শহরটা ভালমত দেখার ইচ্ছে ছিল মুসা আর রবিনের, কিন্তু হতাশ হতে হলো। শহরের ভেতরে গেল না গাড়ি, মোড় নিয়ে বেরিয়ে এল একপ্রান্ত দিয়ে। উঠে পড়ল হাইওয়েতে। পথের দু'ধারে কোথাও পাহাড়, কোথাও খোলা জায়গা।

'অনেক বড় আঙুরের খেত তোমার দাদীর, না?' এক সময় জিজ্ঞেস করল মুসা।

'অনেক বড়,' বলল মিঙ। 'গেলেই দেখবে। মদ চোলাইয়ের কারখানাও আছে। দাদীমা বলে, সব আমাকে দিয়ে যাবে। কিন্তু আমার কেন জানি নিতে ইচ্ছে করে না।'

আগ্রহ প্রকাশ করল রবিন আর মুসা। অনেক কথাই জানাল মিঙ যেতে যেতে।

জানা গেল, ফারকোপার কৌনের প্রপৌত্র মিঙ কৌন। চীনা রাজকুমারী ছিল ফারকোপারের দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিয়ে করেছিল।

যেখানেই যেত, প্রথম স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেত ফারকোপার, জাহাজে যখন সে দূর সাগরে পাড়ি জমাত, তখনও কাছছাড়া করত না। এমনি এক ভ্রমণের সময়েই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেল মহিলা। সদ্যপ্রসূত ছেলেকে নিয়ে মুশকিলে পড়ল ফারকোপার, হংকং থেকে রওনা হয়েছিল, তাড়াতাড়ি ফিরে গেল আবার ওখানেই।

শিশুর দেখাশোনা কে করবে? ফারকোপারের পক্ষে সম্ভব নয়। হংকঙের এক আমেরিকান মিশনারিতে ছেলেকে রাখার ব্যবস্থা করল। এর কিছুদিন পরেই রাজবংশের লোকের সঙ্গে গোলমাল বাধল তার, সুন্দরী রাজকুমারীকে বিয়ে করা নিয়ে। আর থাকা যাবে না চীনে, বুঝে ফেলল। শেষে গোস্ট পার্ল চুরি করে বৌকে নিয়ে পালিয়ে এল আমেরিকায়। তার ছেলে রয়ে গেল হংকঙেই।

সেই ছেলে, রবার্ট কৌন বড় হলো, লেখাপড়া শিখল, কিন্তু আমেরিকায় আর ফিরল না। মিশনারির ডাক্তার হিসেবে থেকে গেল হংকঙেই, বিয়ে করল এক চীনা তরুণীকে। এক ছেলে হলো তাদের, জেমস। কয়েক বছর পরেই পীত জ্বরে প্রায় একই সঙ্গে মারা গেল জেমসের বাবা-মা, এতিম ছেলেটাকে নিয়ে এল মিশনারি। বড় হতে লাগল ছেলে, বড় হয়ে বাবার মতই ডাক্তার হলো সে-ও। চীনেই থেকে গেল। বিয়ে করল এক ইংরেজ মিশনারির মেয়েকে। তাদেরই ছেলে মিঙ। মিঙের যখন কয়েক বছর বয়েস, পীত নদীতে নৌকাডুবিতে মারা গেল তার বাবা-মা। এতিম শিশুর দায়িত্ব নিতে হলো আবার মিশনারির।

এ-পর্যন্ত বলে থামল মিঙ। দীর্ঘশ্বাস চাপল।

চুপ করে রইল রবিন আর মুসা।

সামলে নিয়ে আবার কথা শুরু করল মিঙ, 'নৌকায় আমিও ছিলাম। কিন্তু বেঁচে গেলাম, বাঁচাল জেলেরা। ওরাই পৌঁছে দিয়েছে মিশনারিতে। আমার দাদা আর বাবা যেখানে বড় হয়েছে, সেখানে নয়, অন্য এক মিশনারিতে কয়েক বছর গেল। আমি কে, বাড়ি কোথায় কিছুই জানি না তখন। জানার জন্যে পাগল হয়ে উঠলাম।

শেষে মিশনারি স্কুলের একজন শিক্ষককে বললাম। আমার বাবা আর মায়ের ডাকনাম শুধু জানি, আর জানি আমার বাবা ডাক্তার ছিল। আর দুজনেই যে মিশনারির লোক ছিল, একথা জেলেরাই জানিয়ে গেছে, আমাকে দিয়ে যাওয়ার সময়। পুরানো রেকর্ড ঘেঁটে অনেক কষ্টে আমার পরিচয় বের করলেন স্যার। কিভাবে কিভাবে খোঁজ করে দাদীমার নাম-ঠিকানা জোগাড় করলেন তিনি, চিঠি পাঠালেন তাঁর কাছে।

'দাদীমাই আমাকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছে। তারপর তার সঙ্গেই আছি। আমাকে খুব ভালবাসে। এতদিন ভালই ছিলাম আমরা, হঠাৎ করে আমার দাদার বাবার ভূত এসে গোলমাল করে দিয়েছে সব। খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে দাদীমা। ডলফ-আংকেল অবশ্য তাকে শান্ত করার যথেষ্ট চেষ্টা করছে। আমিও দাদীমাকে সাহায্য করতে চাই, তার ভাল চাই।'

'ভূতের ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়?' প্রশ্ন করল রবিন।

'বুঝতে পারছি না।'

এরপর আর বিশেষ কোন কথা হলো না। উত্তেজনায় ভরা দিন গেছে। ঢুলুঢুলু হয়ে এসেছে মুসার চোখ, রবিনও হাই তুলছে। নরম গদিতে আরামে হেলান দিয়ে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল রবিন। উঁচু পাহাড়ের ওপাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। পাথর আর কাঠে তৈরি বিশাল এক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। দু'পাশে পাহাড়। ছোট্ট একটা উপত্যকায় বাড়িটা। আশপাশে তাকিয়ে দেখল সে। ইতিমধ্যেই পাহাড়ের গোড়ায় অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মাইলের পর মাইল বিছিয়ে থাকা খেত, কালো ছোট ছোট ঝোপ, নিশ্চয় আঙুর লতার ঝাড়।

'মুসা, ওঠো,' ধাক্কা দিল রবিন।

চোখ মেলল মুসা। মুখের কাছে হাত নিয়ে এসে হাই তুলল বড় করে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

মেহমানদের পথ দেখাল মিঙ। চওড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বাড়ির এক পাশের ছোট্ট আঙিনায়।

'এটাই দাদীমার বাড়ি,' বলল মিঙ। 'চলো, আগে তার সঙ্গে দেখা করি।'

রেডউডের প্যানেল করা বিরাট এক হলরুমে এসে ঢুকল ওরা। লম্বা, সম্ভ্রান্ত চেহারার এক মহিলা এগিয়ে এলেন হাসিমুখে, স্বাগত জানালেন ছেলেদের।

'কোন অসুবিধে হয়নি তো?' জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। 'তোমরা এসেছ, খুব খুশি হয়েছি।'

কোন রকম অসুবিধে হয়নি, জানাল রবিন আর মুসা।

তাদেরকে ডাইনিং রুমে নিয়ে চললেন মহিলা।

'জানি, খিদে পেয়েছে তোমাদের,' বললেন দিনারা কৌন, 'বসো, চেয়ারে বসো। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। তাছাড়া সারাদিন খুব কাজের চাপ গেছে। কাল তোমাদের সঙ্গে কথা বলব, হ্যাঁ?' ব্রোঞ্জের ছোট একটা ঘণ্টা বাজালেন তিনি।

মাঝবয়েসী এক চীনা পরিচারিকা এসে ঢুকল।

'ছেলেদের খাবার দাও, সুই,' নির্দেশ দিলেন মিস কৌন। 'মিঙ, তোরও নিশ্চয় খিদে পেয়েছে?'

মিঙ জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল সুই, 'জিজ্ঞেস করার দরকার কি? ওই বয়েসে ছেলেদের খিদে পাবেই। এটাই তো খাওয়ার বয়েস।' তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল পরিচারিকা।

উল্টো দিকের একটা দরজা দিয়ে একজন লোক ঢুকল ঘরে। দেখামাত্র চিনল দুই গোয়েন্দা। ডলফ টার্নার। উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাকে।

'এই যে ছেলেরা, এসে গেছ,' হালকা মিষ্টি গলায় বলল টার্নার। 'কাল কল্পনাও করিনি, আজই তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে। তো আছ কেমন? ভাল?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'কি যে কাণ্ড শুরু হয়েছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউই পারছে না।'

'তোমরা বসো,' রবিন আর মুসাকে বলল মিস কৌন। 'আমি গিয়ে শুয়ে পড়িগে। তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না। মিঙ আছে, সব দেখবে। ডলফ, খুব খারাপ লাগছে। সিঁড়ি বেয়ে যেন উঠতে পারব না, একটু ধরবে আমাকে?'

'নিশ্চয়ই,' দ্রুত এসে মিস কৌনের বাহু ধরল টার্নার। সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল মহিলাকে।

হঠাৎ করেই অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। সুইচ টিপে আলো জ্বালল মিঙ। 'পাহাড়ী এলাকা, হঠাৎ করেই রাত নামে।'

টেবিলে খাবার সাজাল সুই।

'শুরু করো,' বলল মিঙ।

'হ্যাঁ, শুরু করো,' সুই বলল। 'খাওয়ার সময় কথা বেশি বলবে না। পেট পুরে খাও। কোন রকম লজ্জা কোরো না।'

'খাওয়ার ব্যাপারে আমার কোন লজ্জা নেই,' হাত নাড়ল মুসা। প্লেনে কি খেয়েছে না খেয়েছে কখন হজম হয়ে গেছে তার। হাবভাবে মনে হচ্ছে, গত তিন দিন কিছু খায়নি।

জহুরী জহর চেনে। ভোজন রসিককে চিনে নিল অভিজ্ঞ পরিচারিকা। খাবার সরবরাহ করতে লাগল স্নেভাবেই।

গরুর মাংসের ঠাণ্ডা রোস্ট, গরম রুটি, নানারকম আচার, আলুর সালাদ, আর আরও কয়েক রকম ঠাণ্ডা খাবার, চেহারা আর গন্ধে রবিনের খিদেও বেড়ে গেল।

খাওয়া শুরু করতে যাচ্ছে, এই সময় বাধা পড়ল।

দোতলা থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'দাদীমা!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মিঙ। 'নিশ্চয় কিছু হয়েছে।'

পড়িমড়ি করে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল সে। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা। ওদের পেছনে সুই, আর আরও কয়েকজন চাকর—চোখের পলকে কোথা থেকে জানি উদয় হয়েছে ওরা।

ওপরে সিঁড়ির পাশে আরেকটা হল, শেষ মাথায় একটা দরজা খোলা।

সেদিকেই দৌড় দিল মিঙ।

বিছানায় চিত হয়ে পড়ে আছেন মিস কৌন। তার ওপর ঝুঁকে আছে টার্নার। হাতের তালু ডলছে, আর উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছে কিছু। সুইকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'স্মেলিং সল্ট! জলদি।'

ছুটে গিয়ে বেডরুম সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকল সুই, বেরিয়ে এল একটা শিশি হাতে। মুখ খুলে ধরল মিস কৌনের নাকের কাছে।

একটু পড়েই নড়েচড়ে উঠলেন মিস কৌন, আস্তে করে চোখ মেললেন। ভিড় দেখে লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'ছেলেমানুষী করে ফেলেছি, না? জীবনে এই প্রথমবার বেহুঁশ হলাম।'

'কি হয়েছিল দাদীমা?' ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে মিঙ। 'চিৎকার করলে কেন?'

'ভূতটাকে আবার দেখেছি,' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন মহিলা। 'ডলফকে গুড নাইট জানিয়ে বেডরুমে ঢুকলাম। আলো জ্বালতে যাব, এই সময় দেখলাম ওটাকে।'

'কোথায়?'

'ওই জানালাটার ধারে। স্পষ্ট। কড়া চোখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। পরনে সবুজ আলখেল্লা, ঠিক যেমনটি পরত ফারকোপার চাচা। চেহারাটা স্পষ্ট নয়, তবে চোখগুলো পরিষ্কার, লাল টকটকে।' গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আমার উপর রেগে আছে। থাকবে, জানতাম। মা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল তার মৃত্যুর পর বন্ধ রাখবে কৌন ম্যানশন, কক্ষনও খুলবে না। কখনও ওখানকার শান্তি নষ্ট করবে না। অথচ আমি কি করেছি? মায়ের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করেছি, বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয়েছি। তার স্ত্রীর শান্তি নষ্ট করেছি, ফারকোপার চাচা রাগ তো করবেই আমার ওপর।'

ছয়

দিনারা কৌনকে শান্ত করে আবার এসে খাবার টেবিলে বসল রবিন, মুসা আর মিঙ। খাওয়া চলল উত্তেজিত কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে।

কমলার রস খাইয়ে মিস কৌনকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে সুই। মনিবানীর কাছেই রয়েছে। যে হারে ধমক-ধামক মেরেছে চাকর-বাকরকে, তাতে স্পষ্ট বুঝে গেছে দুই গোয়েন্দা, এ-বাড়িতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ওই চীনা মহিলার।

ওপর তলা থেকে নেমে এল টার্নার, গম্ভীর।

'ভূতটা আপনি দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা নাড়ল টার্নার, 'আন্টিকে ঘরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে ফিরেছি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন। লাফ দিয়ে গিয়ে ঢুকলাম। সুইচে হাত রেখে টিপছেন, এই সময় দেখেছেন ভূতটাকে। আমি ঢুকতেই আলো জ্বলে উঠল, ঢলে পড়তে শুরু করলেন তিনি। ধরলাম তাকে, বিছানায় শোয়ালাম। এত তাড়াহুড়োর মাঝে ভূত দেখার সময় কোথায়?' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপাল ডলল সে।

'চাকর-বাকরের মুখ বন্ধ রাখা যাবে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল আবার টার্নার।

grohon.com

ঠেকানো যাবে না কিছুতেই। কাল সকাল হতে না হতেই সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে গুজব।'

'খবরের কাগজকে নিয়ে ভাবনা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'খবরের কাগজওলারা যা ক্ষতি করার করে ফেলেছে। আমি আমাদের শ্রমিকদের কথা ভাবছি। গতরাতেও যে আন্টি ভূত দেখেছেন, ফোনে বলেছেন তোমাদেরকে?'

মাথা ঝোঁকাল মুসা আর রবিন।

'এ-বাড়ির দু'জন চাকরানীও দেখেছে,' বলল টার্নার। 'ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল। অনেক বলেকয়ে বুঝিয়েছি ওদের, খবরটা গোপন রাখতে। বিশেষ কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। সারাদিনে ছড়িয়ে পড়েছে গুজব, রকি বীচের ভূত এসে ঠাঁই নিয়েছে ভারড্যান্ট ভ্যালিতে। ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুষো করছে শ্রমিকরা।'

'শ্রমিকরা ভয় পাবে ভাবছেন?' বলল মিঙ।

'পাবে মানে? সর্বনাশ হয়ে যাবে!' উত্তেজনা দমন করল টার্নার। প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'যাকগে, মেহমানদের অস্থির করে দেয়াটা উচিত হচ্ছে না।' রবিন আর মুসাকে বলল, 'তোমরা এসব নিয়ে কিচ্ছু ভেব না। তো, গোস্ট পার্লের ব্যাপারে আগ্রহ আছে? গতকাল তো ভালমত দেখোনি, আজ দেখতে চাও?'

একই সঙ্গে মাথা কাত করল মুসা আর রবিন।

খাওয়ার পর দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল টার্নার। ডাইনিং রুমের লাগোয়া মাঝারি একটা হল পেরিয়ে ছোট একটা অফিসঘরে ওদেরকে নিয়ে এল সে। চকচকে পালিশ করা বড় একটা টেবিল, টেলিফোন, কয়েকটা ফাইলিং কেবিনেট, আর ঘরের কোণে পুরানো একটা আয়রন সেফ রয়েছে।

ঝুঁকে বসে সেফের ডায়াল ঘোরাতে শুরু করল টার্নার। ক্লিক শব্দ করে খুলে গেল তালা। কার্ডবোর্ডের ছোট একটা বাক্স হাতে ফিরে এল আবার ছেলেদের কাছে। টেবিলে বাক্সটা রেখে ডালা খুলল। নেকলেসটা বের করে রাখল একটা সবুজ ব্লটিং পেপারের ওপর।

ঝুঁকে এল মুসা আর রবিন, তাদের পাশে মিঙ। বড় বড় মুক্তো, একেকটার আকার একেক রকম, ধূসর রঙ। কেমন জানি মুক্তোগুলো। রবিনের মায়ের একটা মুক্তোর হার আছে, মুক্তোগুলোর কিছু লাল, কিছু শাদা, চকচকে, মসৃণ, কিন্তু এই মুক্তোগুলো ওরকম নয়। আঙুল বুলিয়ে দেখল, কেমন খসখসে।

'এমন মুক্তো আর দেখিনি,' বলল মুসা।

'এজন্যেই এগুলোর নাম রাখা হয়েছে গোস্ট পার্ল,' বলল টার্নার। 'এগুলো তোলা হয়েছিল ভারত মহাসাগরের একটা ছোট উপসাগর থেকে। প্রাচ্যের ধনীরা এগুলোর খুব দাম দেয়, কিন্তু আমি বুঝি না কেন। যেমন বাজে চেহারা, তেমনি রঙ। এখনও নেকলেসটার দাম দশ-পনেরো লাখ ডলারের কম না।'

'আরিব্বাবা, তাই নাকি?' ভুরু কুঁচকে গেল মিঙের। 'তাহলে তো সমস্যা মিটে গেল। এটা বিক্রি করেই সমস্ত ঋণ শোধ করতে পারবে দাদীমা, বেঁচে যাবে আঙুরের খেত। নেকলেসটা নিশ্চয় দাদীমা পাবে?'

'কিছু অসুবিধে আছে,' মাথা নেড়ে বলল টার্নার। 'ফারকোপার কৌন নেকলেসটা তার চীনা স্ত্রীকে দান করে দিয়েছিলেন। আইনত এখন ওটা মহিলার কোন নিকট আত্মীয়ের পাওনা।'

'কিন্তু তাঁর পরিবার তাঁকে ত্যাগ করেছে,' অবাক হয়ে বলল মিঙ। 'তাছাড়া চীনের বিপ্লব আর যুদ্ধের সময় তাঁর পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেউ বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ।'

'আছে,' ভুরুর ওপরে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল টার্নার। স্যান ফ্রানসিসকোতে এক চীনা উকিল আছে, সে চিঠি দিয়েছে আমাকে। চীনা মহিলার বোনের এক বংশধর নাকি বেঁচে আছে। নেকলেসটা সাবধানে রাখতে বলেছে, যে কোন সময় ওটা নিতে আসতে পারে। তবে এত সহজে দিচ্ছি না। কেস করবে, করুক। কে পাবে ওটা, সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে রায় দিতে দিতে কয়েক বছর লেগে যাবে আদালতের।'

কপাল কুঁচকে গেল মিঙের। মুখ খুলতে গিয়েও পায়ের শব্দ শুনে থেমে গেল। তাড়াহুড়ো করে কে জানি আসছে। দরজায় জোরে ধাক্কা দিল কেউ।

'কে? এসো,' ডাকল টার্নার।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লম্বা চওড়া, মাঝবয়েসী, কালো এক লোক। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ছেলেদের যেন দেখতেই পেল না, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মিস্টার টার্নার, এক নম্বর প্রেসিং হাউসের কাছে ভূত দেখা গেছে। তিনজন মেকসিকান শ্রমিক দেখেছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ওরা। আপনার যাওয়া দরকার।'

'সর্বনাশ!' গুঙিয়ে উঠল টার্নার। 'এখুনি যাচ্ছি, চলো।' তাড়াতাড়ি নেকলেসটা সেফে ভরে দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর তিন কিশোরকে নিয়ে কাল লোকটার পেছনে পেছনে ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। জীপ অপেক্ষা করছে। চড়ে বসল তাতে। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। দু'পাশের হাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে অন্ধকার উপত্যকা ধরে ছুটে চলল গাড়ি।

পথ খুব খারাপ, উঁচুনিচু, এবড়োখেবড়ো, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ, তাই রক্ষা। নিচু একটা পাকা বাড়ির সামনে এসে থেমে গেল জীপ। কংক্রিট আর ইঁটের তৈরি মজবুত দেয়াল, হেডলাইটের আলোয় দেখল দুই গোয়েন্দা। বাড়িটা নতুন।

লাফিয়ে জীপ থেকে নামল সবাই। আঙুরের রসের তীব্র সুবাসে বাতাস ভারি, সদ্য পিষে বের করা হয়েছে রস।

'ও মিস্টার মরিসন,' কালো লোকটার পরিচয় দিল মিঙ, 'ফোরম্যান। খেত লাগানো আর আঙুর তোলার দায়িত্ব তার।'

বাড়ির অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে এল এক তরুণ, পরনের কাপড়ে বালি আর ময়লা।

হেডলাইট নিভিয়ে দিল মরিসন। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাক, আমি যাওয়ার পর আর কিছু দেখা গেছে?'

'না, স্যার, আর কিছু দেখা যায়নি,' জবাব দিল জ্যাক।

grohon.com

grohon.com

'ওই তিন ব্যাটা কোথায়?'

'কি জানি। আপনি যাওয়ার পরই ভেগেছে। দৌড়ে,' হেসে উঠল জ্যাক, 'সে কি দৌড়। বোধহয় কাফেতে গিয়ে ঢুকেছে,' হাত তুলে উপত্যকার শেষ প্রান্তে এক গুচ্ছ আলো দেখল সে। 'ভূত দেখার গল্প বলছে সবাইকে।'

'মেরেছে!' মরিসনের কণ্ঠে শংকা। 'যেতে দিলে কেন?'

'ঠেকানোর চেষ্টা করেছি। রাখতে পারিনি। এমনই ভয় পেয়েছে।'

'হুঁ, আগুনে কেরোসিন পড়ল!' তিক্ত হয়ে উঠেছে মরিসনের কণ্ঠস্বর। 'ব্যাটারা এখানে অন্ধকারে কি করছিল?'

'আমিই আসতে বলছিলাম, এখানে দেখা করতে বলেছিলাম আমার সঙ্গে। ভূতের কিচ্ছা ওরাই ছড়াচ্ছিল, তাই ধমকে দিতে চেয়েছিলাম, বেশি শয়তানী করলে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেব। আমার আসতে দেরি হয়ে গেল, ওরা অপেক্ষা করেছিল এখানে অন্ধকারে। তখনই নাকি কি একটা দেখেছে, আমার বিশ্বাস হয় না।'

'আমারও না। কল্পনা, স্রেফ কল্পনা। ভূত নিয়ে এত বেশি আলাপ আলোচনা করেছে, ছায়া দেখলেই ভূত ভাবে এখন।'

'কল্পনাই হোক আর যাই হোক, ক্ষতি যা করার করে ফেলেছে,' এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনছিল টার্নার। 'যাও, গাঁয়ে গিয়ে দেখো, বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করতে পার কিনা শ্রমিকদের। মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে।'

'হবে না। বাড়ি দিয়ে আসব আপনাকে?' বলল মরিসন।

'হ্যাঁ...হায় হায়,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে কপালে চাপড় মারল টার্নার। 'মিঙ! নেকলেস রেখে সেফে তালা লাগিয়েছিলাম? মনে আছে?'

'কি জানি, খেয়াল করিনি,' বলল মিঙ।

'আমার মনে হয়,' স্মৃতির আনাচে-কানাচে হাতড়ে বেড়াল মুসা, 'আমার মনে হয়...হ্যাঁ, নেকলেসটা রেখে জোরে দরজা বন্ধ করেছিলেন, হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু ডায়াল ঘুরিয়েছিলাম?'

ভাবল মুসা। মনে করতে পারছে না। 'না, বোধহয়। দরজা লাগিয়েই তো ছুটলেন...'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেছে টার্নারের কণ্ঠ। 'শ্রমিকেরা ভূত দেখেছে শুনে এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, তালা লাগানোর কথাও মনে হয়নি। মরিসন, জলদি, জলদি বাড়ি নিয়ে চলো আমাকে। ছেলেরা থাক এখানেই। ফিরে এসে নিয়ে যেয়ো।'

'ঠিক আছে। মিঙ, এই যে, আর টর্চটা রাখো,' শক্তিশালী একটা টর্চ মিঙের হাতে গুঁজে দিয়ে জীপে গিয়ে উঠল মরিসন। টার্নার আগেই উঠে বসেছে। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল জীপ। জ্যাক চলে গেল গ্রামের দিকে।

'কি কাণ্ড!' ইঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে বলল রবিন। 'প্রথমে বাড়িতে ভূত, তারপর এখানে। কিন্তু মিঙ, ভূত দেখা নিয়ে সবাই এত উতলা হয়ে উঠেছে কেন?'

নীরব অন্ধকারে নিজেদের অজান্তেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এসেছে তিন কিশোর।

পরিবেশ আরও ভয়াবহ করে তুলেছে পোকামাকড়ের একটানা কর্কশ চিৎকার।

'এখন আঙুর তোলার পুরো মৌসুম,' মিঙ বলল। 'রোজই আঙুর পাকছে, তুলে এনে প্রেসিং মেশিনে ফেলছে শ্রমিকরা। রস বের করে রাখা হচ্ছে। ঠিক সময়ে তোলা না হলে বেশি পেকে যাবে, কিংবা পচে যাবে, ভাল মদ আর তৈরি হবে না ওগুলো দিয়ে।' থেমে অন্ধকারেই এদিক ওদিক তাকাল। 'আঙুর তুলতে অনেক লোকের দরকার, কিন্তু সারা বছর এই কাজ হয় না। তাই মৌসুমের সময়ই শুধু আসে শ্রমিকেরা, তারপর চলে যায় অন্য কোথাও। অনেক দেশের লোক আছে। মেকসিকান আর এশিয়ানই বেশি, আমেরিকানও আছে কিছু। দরিদ্র লোক ওরা, কর্মঠ, কুসংস্কারে বোঝাই ওদের মন,' বলে গেল মিঙ। 'রকি বীচে ভূত দেখা যাওয়ার খবর শুনেই শ্রমিকেরা বিচলিত হয়ে উঠেছিল। এখানেও দেখা গেছে শুনলে আর থাকবে না, কোন কিছুর বিনিময়েই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, পালাবে। খেতে আঙুর পচে নষ্ট হবে, তুলে না আনা গেলে রসও হবে না, যাবে এ বছরের ফসল। অনেক টাকা গচ্চা দিতে হবে দাদীমাকে। এমনিতেই সময় এখন ভাল যাচ্ছে না তার, অনেক টাকা ঋণ, তার ওপর ফসল নষ্ট হলে...সে-জন্যেই এত ভেঙে পড়েছে দাদীমা।'

'হুঁ, মুশকিল,' সহানুভূতির স্বরে বলল মুসা। 'সব দোষ তোমার দাদার বাবার। ওর ভূত বাইরে বেরোনোই তো যত গণ্ডগোল।'

'না,' জোর দিয়ে বলল মিঙ, 'আমি বিশ্বাস করি না। দাদার বাবা আমাদের ক্ষতি করতে পারে না, হাজার হোক তার রক্ত আমরা। ওটা অন্য কোন শয়তান লোকের ভূত।'

এত প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটা বলল মিঙ, রবিনের ইচ্ছে হলো বিশ্বাস করে ফেলে। কিন্তু কোন ম্যানশনে ভূতটাকে দেখেছে সে, দেখেছে ঢোলা সবুজ আলখেল্লা। যদি ওটা ভূত হয়, বুড়ো ফারকোপার ছাড়া আর কারও না।

এক মুহূর্ত নীরব রইল তিনজনেই। কি বলবে ভাবছে। অবশেষে বলল রবিন, 'দেখতে পারলে শিওর হতাম রকি বীচ আর এখানকারটা একই ভূত কিনা।'

'শিওর হলে কি হবে? ভূত ভূতই, তা যার ভূতই হোক,' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'ইস, কিশোরটা যদি থাকত এখন।'

'এই ভূতটা এখনও কারও কোন ক্ষতি করেনি,' বলল মিঙ। 'শুধু দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। ভয়ের কিছু নেই। আর যদি দাদার বাবার ভূত হয়ই, তাহলে তো আরও ভয় নেই, আমাদের ক্ষতি করতেই পারে না। রবিন, চলো না এক নম্বর প্রেসিং হাউসে দেখি, এখনও আছে কিনা।'

রবিন আর মুসাকে নিয়ে বিল্ডিংটার চারপাশে একবার চক্কর দিল মিঙ। জায়গাটা তার ভালমত চেনা, টর্চ জ্বালার প্রয়োজনই বোধ করল না। আলো জ্বালল না আরও একটা কারণে, অন্ধকারে ছাড়া দেখা দেয় না ভূতটা।

চেয়ে চেয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল ওরা, কিন্তু ভূতের দেখা নেই, শুধু অন্ধকারে বাড়িটার কালো ছায়া, বিরাট আরেকটা ভূতই যেন। হাঁটতে হাঁটতেই মিঙ জানাল, আঙুর এনে এখানে বড় বড় ট্যাংকে রাখা হয়। মেশিনের সাহায্যে

চিপে রস বের করা হয়, সেই রস গড়িয়ে গিয়ে জমা হয় অন্য ট্যাংকে। সেখান থেকে পাম্পের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হয় মদ চোলাইয়ের কারখানায়। সে এক এলাহি কাণ্ড। পাহাড়ের বিরাট গুহার ভেতরে ছোট পুকুর কাটা হয়েছে, তাতে জমা হয় আঙুরের রস, বিশেষ পদ্ধতিতে মদ তৈরি হতে থাকে। সারা বছরই উত্তাপ আর আর্দ্রতা এক রকম থাকে গুহার ভেতরে, মদ বানানোর জন্যে এটা খুব দরকার।'

মিঙের কথায় বিশেষ মন নেই রবিনের। সে ভূতটাকে খুঁজছে।

'চলো ভেতরে যাই,' বলল মিঙ। 'মেশিন আর ট্যাংকগুলো দেখাব। একেবারে নতুন, মাত্র গত বছর কেনা হয়েছে। কিনে এনেছে ডলফ-আংকেল। বাকিতে। অনেক টাকা। কি করে শোধ করবে ভাবছে দাদীমা। তার ধারণা, এত টাকা কোনদিনই শোধ করতে পারবে না।'

হেডলাইটের আলো দেখা গেল। খানিক পরেই ছেলেদের পাশে এসে থামল জীপ।

'এসো, ওঠো,' ডাকল মরিসন, 'বাড়িতে দিয়ে আসি। কাজ আছে আমার। গাঁয়ে গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে তিন হারামজাদাকে। শ্রমিকদেরও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করা দরকার।'

'হ্যাঁ, খুব জরুরী কাজ,' বলল মিঙ। 'আপনি চলে যান না। মাত্র তো মাইলখানেক, আমরা হেঁটেই চলে যেতে পারব। এই যে, আপনার টর্চ। চাঁদ উঠছে, অসুবিধে হবে না আমাদের।'

'ঠিক আছে,' মাথা কাত করল মরিসন। 'এতক্ষণে ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের ভাগিয়ে দিয়েছে কিনা হারামজাদারা, কে জানে।'

ইঞ্জিনের গর্জন তুলে পাহাড়ী পথ ধরে উপত্যকার শেষ প্রান্তের আলোকগুচ্ছের দিকে চলে গেল ট্রাক।

'ইস্‌সি, চলে যেতে যে বললাম,' বলল মিঙ, 'তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না তো?'

'না না, অসুবিধে কিসের,' তাড়াতাড়ি বলল রবিন, 'হাঁটতে বরং ভালই লাগবে। দেখতে দেখতে যাব।'

ধুলো আর পাথরের কুচিতে ভরা আঁকাবাঁকা পথ, জ্যোৎস্নার আলোয় ধূসর। বাতাসে পাকা আঙুরের গন্ধ।

চলতে চলতে বলল মিঙ, 'ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালিয়ে ছাড়বে ওই ভূত। শ্রমিকদের ঠেকানো যাবে না, চলে যাবেই। অনেক টাকা গচ্চা দিতে হবে দাদীমাকে, মেশিনের টাকা শোধ করতে পারবে না। খেত খামার সব তার কাছ থেকে নিলাম করে নেবে ব্যাংক।' একটু চুপ থেকে বলল, 'একটাই উপায় আছে এখন। মুক্তোর মালাটা। ওটা যদি পাওয়া যেত, বিক্রি করে ঋণ শোধ করে দেয়া যেত।'

কেউ কোন জবাব দিল না। কি বলবে? নেকলেস কে পাবে, সেটা কৌন পরিবারের ব্যক্তিগত সমস্যা, আদালত নিষ্পত্তি করবে, এ-ব্যাপারে রবিন আর মুসা কি সাহায্য করতে পারবে?

এরপর আর কোন কথা হলো না। তিনজনেই চিন্তিত, চুপচাপ হাঁটতে থাকল বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ আলোই নিভানো, কয়েকটা শুধু জ্বলছে। আশপাশটা বড় বেশি শান্ত।

সিঁড়ি বেয়ে আঙিনায় উঠল ওরা। কারও সাড়া না পেয়ে অবাক হলো মিঙ। বিড়বিড় করল, 'গেল কোথায় সব? চাকরবাকরেরা না হয় ঘুমাতে গেছে, কিন্তু ডলফআংকেল? তার তো এ-সময়ে হলে থাকার কথা। অফিসে?'

অফিসরুমে রওনা হলো মিঙ, পেছনে দুই গোয়েন্দা। দরজা ভেজানো। টোকা দিল মিঙ। জবাবে গোঙানি শোনা গেল, আর ঘষার আওয়াজ।

সতর্ক হয়ে উঠল মিঙ, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা। মেঝেতে পড়ে আছে টার্নার, হাত-পা বাঁধা। বাদামী একটা কাগজের ঠোঙা মাথার উপর দিয়ে টেনে এনে মুখ ঢেকে দেয়া হয়েছে।

'আংকেল!' চেঁচিয়ে উঠে ছুটে গেল মিঙ।

মাথার ঢাকনাটা খুলতে শুরু করল আগে সে, রবিন আর মুসা তাকে সাহায্য করল। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন টার্নারের। কথা বলতে পারছে না, মুখে কাপড় বাঁধা।

'দাঁড়ান, আগে বাঁধন কেটে নিই,' হাত তুলল মিঙ, 'তারপর সব শুনব।'

পকেট নাইফ বের করে আগে মুখের কাপড় কাটল সে, তারপর হাত পায়ের বাঁধন খুলতে শুরু করল। জোরে জোরে দম নিচ্ছে টার্নার। বাঁধন কাটা হতেই কব্জি আর গোড়ালি ডলতে শুরু করল।

'কি হয়েছিল?' জানতে চাইল মুসা।

'বাড়িতে ফিরে অফিসে ঢুকলাম। দরজার আড়ালে লুকিয়েছিল ব্যাটা। পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল, কোথা থেকে আরেকটা এসে হাজির হলো। দু'জনে মিলে আমাকে মেঝেতে ফেলে বেঁধে ফেলল। তারপর ঠোঙাটা টেনে দিল মাথায়। সেফের দরজা খোলার শব্দ···সেফ!' লাফ দিয়ে আয়রন সেফটার দিকে ছুটে গেল সে।

ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে আছে পাল্লা। ঝটকা দিয়ে একটানে খুলে ফেলল পুরোটা। খোঁজাখুঁজি করল। ঘুরল ধীরে ধীরে। মুখ ফেকাসে।

'নেকলেসটা,' ফিসফিস করে বলল সে, 'নেই!'

সাত

বসার ঘরে চুপচাপ বসে আছে কিশোর, একা। চাচা-চাচী বাড়ি নেই। গভীর ভাবনায় ডুবে আছে সে, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। হঠাৎ সোজা হলো, ঠোঁটের কাছ থেকে সরে এল হাত। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, যত জোরে পারে। অপেক্ষা করতে লাগল।

বারান্দায় পায়ের আওয়াজ হলো। খানিক পরেই দরজায় উঁকি দিল বোরিস, বিশালদেহী দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, ইয়ার্ডের কর্মচারী! তার ভাই রোভার গেছে মেরিচাচী আর রাশেদ চাচার সঙ্গে, স্যান ডিয়েগোতে।

grohon.com

'কি হয়েছে, কিশোর?' বোরিস উদ্বিগ্ন।

'শোনা গেছে তাহলে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।

'যাবে না? বাড়ি ফাটিয়ে ফেলেছ। তোমার জানালা খোলা, আমার জানালা খোলা। কি ব্যাপার, বাড়িটাড়ি মেরেছে?' কিশোরের মাথা আর কাঁধে চোখ বোলাচ্ছে বোরিস।

ফিরে তার ঘরের জানালার দিকে তাকাল কিশোর, খোলা। চোখে ক্ষোভ জমল।

'কি ব্যাপার?' আবার জানতে চাইল বোরিস। 'কিছু হয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

'হয়নি, শুধু জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি।'

'তাহলে চেঁচালে কেন?'

'চিৎকার প্র্যাকটিস করছিলাম।'

'কিশোর, তুমি ঠিক আছ?' ভুরু কোঁচকাল বোরিস। 'অসুস্থ নও তো? হোকে (ও কে)?'

'ইয়েস, হোকে,' হাসল কিশোর। 'আপনি যান, ঘুমোনগে। আজ রাতে আর চেঁচাব না।'

'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে,' সন্দেহ যাচ্ছে না বোরিসের। কিন্তু আর কিছু বললও না, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল তার ঘরে। দু'ভাই একই ঘরে থাকে, মূল বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ছোট্ট একটা কটেজে।

যেখানে ছিল সেখানেই বসে রইল কিশোর। মগজে চিন্তার ঘূর্ণিপাক। কি যেন একটা আসি আসি করছে মনে, কিন্তু আসছে না, সবুজ ভূতের ব্যাপারে। ক্ষান্ত দিয়ে শেষে উঠে পড়ল। শোয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

দোতলায় যাওয়ার জন্যে উঠল। আচ্ছা, রবিন আর মুসা কি করছে?—ভাবল সে। যেন তার প্রশ্নের জবাব দিয়েই বেজে উঠল টেলিফোন। দুই লাফে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল সে। 'কি ব্যাপার রবিন? ভূতটা আবার দেখেছ?'

'না, মিস কৌন দেখেছেন,' উত্তেজিত শোনাল রবিনের কণ্ঠ। 'তারপর যা সব কাণ্ড ঘটল না...'

'বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ,' বাধা দিল কিশোর। 'শান্ত হয়ে বলো সব। কিছু বাদ দেবে না। যখন যেভাবে ঘটেছে, বিস্তারিত বলো।'

এ-মুহূর্তে কাজটা রবিনের জন্যে বেশ কঠিন। নেকলেস চুরির কথা বলার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু ওভাবে শুনতে চায় না কিশোর, জোর করে নিজেকে শান্ত করল রবিন। এক এক করে বলে গেল, সে আর মুসা ভারড্যান্ট ভ্যালিতে যাওয়ার পর কি কি ঘটেছে। সব শেষে নেকলেস চুরির ঘটনা বলে হাঁপ ছাড়ল।

'হুঁমম,' বলল কিশোর। জোরে জোরে দম নিচ্ছে রবিন, শুনতে পাচ্ছে টেলিফোনেই। 'এটা আশা করিনি। তো, এখন কি হচ্ছে? তদন্তের আয়োজন চলছে?'

'স্থানীয় শেরিফকে ডেকে এনেছে টার্নার, শেরিফ হামক্রে। তিন কাল শেষ, এক

কালে ঠেকেছে বয়েস, কাজকর্ম কিছু বোঝেটোঝে মনে হয় না। শহর থেকে অনেক দূরে ভারড্যান্ট ভ্যালি, কাছাকাছি থানা নেই, পুলিশ নেই, শেরিফ আর তার সহকারীই ভরসা। সহকারীটাও বসেরই মত, গাল দেয়া ছাড়া আর কিছু জানে না।

'শেরিফের ধারণা, কাগজে নেকলেসটার খবর পড়ে শহর থেকে চোর এসে চুরি করে নিয়ে গেছে। ওরা যখন সেফ খুলছিল, টার্নার তখন ঘরে ঢুকেছে। তাকে বেঁধে হারটা নিয়ে পালিয়েছে চোর আর তার সহকারী। শেরিফ বলছে, ইতিমধ্যে অর্ধেক পথ চলে গেছে চোরেরা। স্যান ফ্রানসিসকোর পুলিশকে ফোন করবে, কিন্তু ভাবছে কোন লাভ হবে না।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। একেবারে অযৌক্তিক কথা বলেনি শেরিফ। কিন্তু কিশোর বিশ্বাস করতে পারছে না। সবুজ ভূতের সঙ্গে এই হার চুরির কোন সম্পর্ক নেই তো?

'তুমি আর মুসা চোখ খোলা রেখো,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'আমি ওখানে থাকতে পারলে ভাল হত। কিন্তু যেতে পারছি না। চাচা চাচী বাড়ি নেই, আরও একদিন থাকবে স্যান ডিয়েগোতে, রোভারও নেই, বোরিস একা সামলাতে পারবে না। যোগাযোগ রেখো। যখন যা ঘটে, ফোনে জানিও।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

নতুন করে আবার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার লোভ জাগছে, কিন্তু জোর করে দমন করল ইচ্ছেটা। ঘুমাতে চলল।

নানারকম স্বপ্ন দেখল, ঘুমের মধ্যেই একটা কণ্ঠ শুনল চেনা চেনা, কিন্তু চিনতে পারল না।

পরদিন সকালে মনে রইল না, রাতে কি স্বপ্ন দেখেছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মনেপ্রাণে আশা করল কিশোর, যাতে কাজ বেশি না থাকে ইয়ার্ডে, ক্রেতা না আসে, তাহলে হার চুরির ব্যাপারটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারবে।

কিন্তু ঘটল উল্টো। একের পর এক খরিদ্দার আসতেই থাকল, দরকষাকষি করতে লাগল, তর্ক করল, দু'এক জন তো জিনিস আর দর নিয়ে আরেকটু হলে ঝগড়াই বাধিয়ে দিত। হিমশিম খেয়ে গেল কিশোর আর বোরিস, ঘেমে সারা। একটা মিনিট চুপ করে বসতে পারল না কিশোর, ভাববে কখন? পাঁচটার সময় অফিস বন্ধ করে দিল সে। বিক্রি বন্ধ। দম ফেলার অবকাশ পেল এতক্ষণে।

সুযোগ মিলতেই ভাবতে বসে গেল কিশোর। ধীরে ধীরে একটা ধারণ রূপ নিতে শুরু করল মনে।

'বোরিস,' চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর, 'আপনি থাকুন। আমি চললাম।'

কিশোরের স্বভাব বোরিসের জানা। পাল্টা কোন প্রশ্ন করল না। বলল, 'ঠিক আছে, যাও। আমি আছি। কোথায় যাচ্ছ?'

'তদন্ত করতে,' বোরিসকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। দ্রুত চালিয়ে শহরের প্রান্তে ছোট একটা জলাশয়ের ধারে জংলা জায়গায় চলে এল, এখানেই কৌন ম্যানশন। ড্রাইভওয়েতে ঢুকে

grohon.com

দেখল, বাড়ির সামনে পুলিশের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরকে দেখে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করল একজন পুলিশ। আগের দিন সকালে চীফের সঙ্গে যখন এসেছিল তখন এই লোকটাকে এখানে দেখেছিল কিশোর।

'সাইকেল ঘোরাও, খোকা,' বলল লোকটা। 'কৌতুহলী দর্শকদের তাড়ানোর জন্যেই পাহারায় আছি এখানে। উফফ্, সারাটা দিন···আর ভাল্লাগছে না এখন।'

স্ট্যাণ্ডে সাইকেল তুলে পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। 'আরও অনেকে এসেছিল?'

'এসেছে মানে?' মুখ বাঁকাল লোকটা। 'পাগল করে দিয়েছে আমাকে। সুভনির শিকারিদের জ্বালায়···উফফ্, বদ্ধ পাগলের দেশ এটা। বেশি কথা বলতে পারব না, খোকা, চলে যাও।'

'আমি সুভনিরের জন্যে আসিনি,' এগিয়ে এল কিশোর। 'গতকাল দেখেছেন আমাকে, মনে নেই? আপনাদের চীফের সঙ্গে এসেছিলাম।'

ভাল করে তাকাল পুলিশম্যান। 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ···সেজন্যেই চেনা চেনা লাগছিল। তা কি ব্যাপার?'

তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরল কিশোর, 'আমি কিশোর পাশা।'

কার্ড পড়ে হাসতে গিয়েও থেমে গেল পুলিশম্যান, কি জানি, চীফের সঙ্গে এসেছিল যখন, ফেলনা না-ও হতে পারে। 'গোয়েন্দা, না? চীফের হয়ে কাজ করছ?'

'তাঁর হয়ে করছি না, তবে আমি যা করব, সফল হতে পারলে খুব খুশি হবেন চীফ। আগেও অনেক কাজ করেছি।' এখন কি করতে চায়, জানাল কিশোর।

মাথা ঝোঁকাল পুলিশম্যান। 'ঠিক আছে। যাও।'

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির বারান্দায় উঠল কিশোর, ভেতরে ঢুকল। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে সব। যেদিক থেকে ভাঙা শুরু হয়েছে, সেখানে এসে দাঁড়াল। পরীক্ষা করে দেখল, দেয়াল খুব পুরু।

আর কোন গোপন কুঠরি খোঁজার চেষ্টা করল না কিশোর, পুলিশই ভালমত খুঁজেছে, অহেতুক সময় নষ্ট করা হবে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে। এক মিনিট অপেক্ষা করে নিচে নেমে বড় হলে রুমটায় ঢুকে আবার চিৎকার করল। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। পুলিশম্যানের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু শুনেছেন?'

'চিৎকার শুনেছি। একবার একেবারে ক্ষীণ, আরেকবার একটু জোরে। দরজা বন্ধ ছিল তো।'

'ভূত যে-রাতে চেঁচিয়েছে, তখনও দরজা বন্ধ ছিল,' বলল কিশোর। এদিক ওদিক তাকাল। বাড়ির এক কোণে একটা বড় সাজান ঝোপ দেখে তার ভেতরে এসে ঢুকল। চেঁচিয়ে উঠল জোরে। বেরিয়ে আবার পুলিশম্যানের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'এবার?'

'অনেক জোরে,' জবাব দিল লোকটা, 'স্পষ্ট। কিন্তু কি প্রমাণের চেষ্টা করছ?'

'কোথা থেকে চেঁচিয়েছিল ভূতটা। নিশ্চয় বাইরে ছিল। বাড়ির ভেতরে থেকে

চেঁচিয়ে থাকলে স্বীকার করতেই হবে, ব্যাটার ফুসফুসের জোর অসাধারণ।'

'ভূতের ফুসফুস আছে কিনা তাই বা কে জানে,' হাসল পুলিশম্যান।

কিন্তু কিশোর হাসল না। 'এটাই পয়েন্ট।'

বুঝতে না পেরে মাথা চুলকাল লোকটা। বোঝাল না তাকে কিশোর, সাইকেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

'খোকা,' ডাকল পুলিশম্যান, 'কার্ডে এই আশ্চর্যবোধগুলো কেন?'

হেসে ঘুরে চাইল কিশোর। 'লোকের কৌতূহল জাগানোর জন্যে। তাছাড়া সব রকম আশ্চর্য, উদ্ভট রহস্যের সমাধান করতে চাই আমরা, চিহ্নগুলো দেয়ার সেটা আরেক কারণ।'

সাইকেলে উঠে আরেকবার ফিরে তাকাল কিশোর, তখনও মাথা চুলকাচ্ছে পুলিশম্যান। মুচকি হেসে বেরিয়ে এল ড্রাইভওয়ে ধরে।

কিন্তু বেশি দূরে গেল না কিশোর। কৌন ম্যানশন থেকে কয়েক ব্লক দূরে এসে থামল। আধুনিক মডেলের কয়েকটা বাড়ি এখানে, ফা'রকোপারের মধ্যযুগীয় বাড়িটার সঙ্গে বেমানান। সঙ্গে করে স্থানীয় পত্রিকার কিছু পেপার কাটিং নিয়ে এসেছে সে। যে চারজন লোক ভূত দেখার কথা রিপোর্ট করেছে থানায়, তাদের নামধাম লেখা আছে। ঠিকানা খুঁজে একটা বাড়ি বের করল সে। ড্রাইভওয়েতে ঢুকল। এই সময় একটা গাড়ি ঢুকল, কিশোরের পাশে থেমে গেল। ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে নামল একজন লোক। জিজ্ঞেস করল, কি চায়। জানাল কিশোর।

লোকটা চারজনের একজন, নাম, হ্যারি পিটারসন। সানন্দে কিশোরের প্রশ্নের জবাব দিল।

জানা গেল, পিটারসন আর তার এক প্রতিবেশী হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছিল সে-রাতে, সিগারেট ফুঁকছিল আর বেসবল নিয়ে আলোচনা করছিল, এই সময় দুজন লোক ডাকে তাদেরকে পেছন থেকে। অচেনা লোক, হ্যারি আর তার প্রতিবেশী মনে করছে, আগন্তুক দুজনও তাদের প্রতিবেশী হবে, হয়তো নতুন এসেছে এ-এলাকায়। নইলে এভাবে যেচে এসে কথা বলবে কেন? জ্যোৎস্না ছিল। চাঁদের আলোয় পোড়ো বাড়িটা কেমন দেখা যায়, দেখতে যাওয়ার কথা তুলল দুই আগন্তুক। ভালই লাগল প্রস্তাব। রাজি হয়ে গেল পিটারসন আর তার প্রতিবেশী বন্ধু। আগন্তুকদের একজনের ভারি কণ্ঠস্বর।

গ্যারেজ থেকে দুটো টর্চ নিয়ে এল পিটারসন, একটা দিল তার বন্ধুকে।

চারজনে চলল কৌন ম্যানশনের দিকে। পথে আরও দুই প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা, তাদেরকেও সঙ্গে যেতে রাজি করিয়ে ফেলল ভারিকণ্ঠ। খুব মজা পাচ্ছিল যেন সে, ভূত নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছিল, তার ধারণা পোড়ো বাড়িতে ভূতের দেখা মিলে যেতে পারে।

'ভূত দেখা যাবেই, জোর দিয়েছিল, একথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝোঁকাল পিটারসন। 'তা দিয়েছিল। তার কথা ফলেছে। একেবারে জলজ্যান্ত ভূত, আশ্চর্য!'

'লোক দু'জনকে চেনেন না বলছেন?'

'নাহ্। তবে একজনকে আগে কোথাও দেখেছি মনে হয়েছিল। অন্যজন একেবারে অচেনা। আশেপাশেই কোথাও থাকে ভেবেছিলাম। অনেক প্রতিবেশী আমাদের, সবাইকে চিনি না, চেনা সম্ভবও নয়। গত এক বছরে অনেক নতুন লোক এসেছে।'

'মোট ক'জন গিয়েছিলেন আপনারা?'

'ছয়,' ভেবে বলল পিটারসন। 'কারও কারও ধারণা, সাতজন, কিন্তু ড্রাইভ-ওয়েতে যখন ঢুকি তখন ছ'জনই ছিল। হতে পারে, পেছন পেছন আরও একজন এসেছিল, তবে আমি দেখিনি। তারপরে যা কাণ্ড শুরু হলো, লোক গোণার কথা মনে থাকে নাকি কারও? তাছাড়া গাঢ় অন্ধকার ছিল। কৌন ম্যানশন থেকে বেরিয়ে অচেনা দু'জন চলে গেল। আমি আর আমার তিন প্রতিবেশী ঠিক করলাম, পুলিশে খবর দিতে হবে। ওই দু'জনের আর কোন খোঁজ পাইনি।'

বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোট রোমশ কুকুর, আদুরে গলায় কুঁইকুঁই করে পিটারসনের পায়ে গা ঘষতে লাগল।

'লক্ষ্মী ছেলে,' নিচু হয়ে কুকুরটার গায়ে হাত বুলোল পিটারসন।

'এই কুকুরটাকেই নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ, হাঁটতে বেরোলেই জিমিকে সঙ্গে নিই, বিশেষ করে বিকেলে। সেরাতেও নিয়েছিলাম।'

কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। জানোয়ারটাও তাকাল তার চোখে চোখে। মুখ হাঁ, জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে, যেন হাসছে তার দিকে চেয়ে! ভুরু কোঁচকাল কিশোর। আবার কিছু একটা মনে আসি আসি করেও আসছে না।

আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল কিশোর, কিন্তু নতুন কিছুই জানাতে পারল না পিটারসন, তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাইকেলে চড়ে বেরিয়ে এল সে।

ধীরে ধীরে প্যাডাল করে চলেছে কিশোর, গভীর চিন্তায় মগ্ন। ইয়ার্ডে পৌঁছে দেখল, বিশাল সদর দরজা বন্ধ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এতক্ষণে খেয়াল হলো, তদন্ত করতে গিয়ে বেশ দেরি করে ফেলেছে।

নিজের ঘরে বসে আরামে পাইপ টানছে বোরিস। কিশোর উঁকি দিতেই ডাকল, 'এসেছ। এসো এসো। খুব ভাবছ মনে হচ্ছে?'

'বোরিস,' ঘরে ঢুকল কিশোর, 'গতরাতে আমার চিৎকার শুনেছেন। কি রকম মনে হয়েছিল?'

'মনে হয়েছিল বাড়ি মেরে কোন শুয়োরের ঠ্যাঙ ভেঙে দেয়া হয়েছে।'

'কিন্তু আমার জানালা যদি বন্ধ থাকত, শুনতে পেতেন?'

'বোধহয় না। কি বোঝাতে চাইছ?'

উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ। চিৎকারটা সবাই শুনেছে, পিটারসনের ছোট কুকুরটাও। হয়তো কোন সূত্র দিতে পারবে ওটা। শার্লক হোমসকে অনেক সময় অনেকভাবে সাহায্য করেছে কুকুর।

তাড়াহুড়ো করে নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। খুলতে শুরু করেছে কয়েকটা প্যাঁচ।

কৌন ম্যানশনে দরজা-বন্ধ ঘরে চিৎকার করেছিল সে, তার চিৎকার স্পষ্ট শুনতে পায়নি পুলিশম্যান। কিন্তু বাইরে এসে ঝোপের ভেতর থেকে যখন চিৎকার করল, স্পষ্ট শুনতে পেল। এটা একটা জোরাল পয়েন্ট।

টেপরেকর্ডার বের করে রবিনের রেকর্ড করে আনা ক্যাসেটটা চালু করে দিল। মন দিয়ে শুনল চিৎকার, কথাবার্তা আর যতরকম আওয়াজ শোনা গেল সব। তারপর চুপচাপ ভাবল কয়েক মিনিট। সেদিন রবিন যা যা বলেছে, আবার পর্যালোচনা করে দেখল মনে মনে। যাচ্ছে, খাপে খাপে বসে যাচ্ছে! কিন্তু অনেকগুলো ব্যাপার এখনও অস্পষ্ট, কিংবা দুর্বোধ্য।

ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালার দরকার মনে করল না কিশোর, হঠাৎ উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল। অনেকক্ষণ পর ওপাশে ফোন তুলল কেউ।

'হ্যালো, রবিনকে দেয়া যাবে?' অনুরোধ করল কিশোর।

'কে, কিশোর পাশা?' মিস দিনারা কৌনের কণ্ঠ, কাঁপছে।

'হ্যাঁ। রবিনকে দরকার, মিস কৌন। কয়েকটা জরুরী কথা···।'

'···রবিন তো নেই।'

'নেই?'

'নেই,' অস্থির কণ্ঠস্বর। 'মুসাও নেই। আমার নাতি মিঙও গায়েব।'

আট

নেকলেস চুরির খবর যে রাতে ফোনে কিশোরকে জানিয়েছে রবিন, তার পরদিন সকালে উঠে নাস্তা সেরে মিঙের সঙ্গে বেরোল সে আর মুসা, ভারড্যান্ট ভ্যালি দেখতে। সেই গুহা দেখতে যাবে, আঙুরের রস গাঁজিয়ে যেখানে মদ তৈরি হয়! মিঙ জানাল, পুকুরটা নতুন কাটা হয়েছে, কিন্তু ওই গুহা আর আশেপাশের সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে অনেক আগে, খনি ছিল ওটা এক সময়।

সারাদিন বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই ছেলেদের, ঘুরবে, দেখবে কি আছে না আছে। বাড়ি গিয়ে কি হবে? নেকলেস চুরির রহস্য ভেদ করতে পারবে না তারা। শেরিফ হামফ্রের ধারণা ঠিক হলে, চোর এতক্ষণে নিশ্চয় স্যান ফ্রানসিসকোতে পৌঁছে গেছে, ওকে ধরা এখন পুলিশের পক্ষেও কঠিন। আরও একটা কারণে রাতের আগে ফেরার ইচ্ছে নেই। রিপোর্টার।

সকাল থেকেই খবরের কাগজের লোকজন আসতে শুরু করেছে, তিন কিশোরের অনুমান, নিশ্চয় এখন বাড়িতে গিজ-গিজ করছে লোকে। ছেঁকে ধরেছে মিস কৌনকে। জবাব দিতে দিতে জান খারাপ হয়ে যাচ্ছে হয়তো মহিলার। ফিরে গেলে তিন কিশোরকেও ওদের মুখোমুখি হতে হবে, ওই ঝামেলার মধ্যে থাকতে রাজি না ওরা।

আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে এসেছে ওরা। ঘোড়ায় চড়তে ওস্তাদ মিঙ, মুসা আর রবিনও পারে—জিনার কাছে শিখেছে, তবে মিঙের মত নয়। জিনা আর মিঙ

grohon.com

grohon.com

প্রতিযোগিতায় নামলে বোঝা যেত, দু'জনের মাঝে কে বেশি দক্ষ।

বিষণ্ণ দেখাচ্ছে মিঙকে। 'শ'খানেক শ্রমিক থাকার কথা ছিল এখন,' বলল সে, 'বেশ কয়েকটা ট্রাক থাকার কথা, আঙুর বোঝাই করে প্রেসিং হাউসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। অথচ দেখো, মোটে বারো-তেরোজন লোক আছে। মাত্র একটা ট্রাক। ভূতের ভয়ে পালিয়েছে সব। দাদীমার সর্বনাশ হয়েই গেল। কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না!'

কোন জবাব জোগাল না রবিনের মুখে।

মিঙকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে মুসা বলল, 'এত ভেঙে পড়ছ কেন? আমাদের কিশোর তো আছে। রকি বীচে ভূতের রহস্য সমাধানে ব্যস্ত এখন সে। অসাধারণ বুদ্ধিমান, দেখো সমাধান করে ফেলবে। ভূতের ভয় না থাকলে আবার ফিরে আসবে শ্রমিকেরা।'

'খুব তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারলে হত,' বলল মিঙ, 'নইলে, অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে নেবে শ্রমিকেরা। আজ সকালে সুই কি বলল জানো? আমিই নাকি সকল অনর্থের মূল, আমি অলক্ষুণে। আমি আসার পর থেকেই নাকি যত গোলমাল শুরু হয়েছে ভারড্যান্ট ভ্যালিতে।'

'বাজে কথা,' জোর গলায় বলল রবিন, 'কুসংস্কার। অলক্ষুণে আবার হয় নাকি মানুষ?'

মাথা নাড়ল মিঙ। 'জানি না। তবে এটা ঠিক, আমি আসার পর থেকেই একটার পর একটা গোলমাল হয়ে চলেছে। এক সঙ্গে অনেক পিপা মদ একবার নষ্ট হয়ে গেল; পিপায় ফুটো হয়ে মদ পড়ে গেল, মেশিনের পার্টস ভাঙল। আরও নানারকম গণ্ডগোল। কিছুই যেন ঠিকমত চলতে চাইছে না।'

'তাতে তোমার কি দোষ?' মুসা বলল।

'কিছু কিছু অলক্ষুণে মানুষ থাকে না।' বলল মিঙ, 'আমিও তেমনি একজন হতভাগ্য হয়তো। আমি হংকঙে ফিরে গেলে হয়তো আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, ভূত চলে যাবে, আবার হেসে উঠবে ভ্যারড্যান্ট ভ্যালি। যদি শিওর হতে পারতাম, কালই চলে যেতাম। দাদীমার কষ্ট আমি সইতে পারি না।'

এই বিষণ্ণতা কাটানো দরকার, নইলে দিনটাই মাটি হবে, ভাবল রবিন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যে বলল, 'এই ভারড্যান্ট ভ্যালি তোমারই হবে, না? আর কোন ভাগবাঁটোয়ারা নেই?' দু'পাশে পাহাড়ের দেয়াল, মাঝে যতদূর চোখ যায় শুধু আঙুরের ঝোপ, সেদিকে তাকিয়ে আছে সে।

'দাদীমা তার সমস্ত সম্পত্তি আমাকেই উইল করে দিতে চায়। কিন্তু আমি ভাবছি, অর্ধেক ডলফ আংকেলকে দিয়ে দেব। এখানকার উন্নতির জন্যে অনেক করেছে সে। খেতখামার বাড়িয়েছে, নতুন মেশিন আনিয়েছে,' আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়ল মিঙ, 'অনেক লাভ হত। এক বছরেই শোধ করে দেয়া যেত ব্যাংকের ঋণ, কিন্তু সব শেষ করে দিল ওই হারামী ভূত।'

সরু পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে এল একটা জীপ, ওটাকে সাইড দেয়ার জন্যে পথের একেবারে কিনারে চলে এল তিন ঘোড়সওয়ার। খুব তেজি একটা

কালো কোল্ট ঘোড়ায় চড়েছে মিঙ, মুসারটা কম বয়েসী ঘোটকী, চঞ্চল, সামলাতে অসুবিধেই হচ্ছে গোয়েন্দাসহকারীর, একটু এদিক ওদিক হলেই উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবে ঘোড়াটা। রবিনেরটাও মাদী ঘোড়া, বয়স্ক, একেবারে শান্ত, যেভাবেই চালানো হচ্ছে, সেভাবেই চলছে।

পাশে এসে থেমে গেল জীপ। মুখ বাড়াল ফোরম্যান মরিসন। 'হেই, মিঙ, অবস্থা তো খুব খারাপ। শ্রমিক নেই, দেখেছ?'

মাথা ঝোকাল মিঙ।

'ওই তিন শয়তানের কাণ্ড,' বলল মরিসন, 'ধসিয়ে দিয়েই ছাড়ল শেষকালে। লোক জোগাড়ের অনেক চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। কেউ আসতে রাজি না।'

চুপ করে রইল মিঙ।

'মিস কৌনকে জানাতে যাচ্ছি। গতিক সুবিধের না।'

জোর করে নিজের বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলল মিঙ। 'যাকগে, যা হওয়ার হবে। ভাগ্যের ওপর তো কারও হাত নেই। চলো, আমাদের কাজ আমরা করি।'

পুরো উপত্যকায় ঘুরে বেড়াল ওরা। মাঝেমধ্যে থেমে এটা-ওটা দেখল। প্রেসিং হাউসগুলো সব দেখাল মিঙ। দুপুরের দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা, খিদেও লেগেছে খুব। সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আর ক্যান্টিনে পানি নিয়ে এসেছে, ব্যাগে করে এনেছে ঘোড়ার খাবার।

'ঠাণ্ডা একটা জায়গা আছে,' জানাল মিঙ, 'আরামে বসে খাওয়া যাবে।' পুরানো একটা বিল্ডিঙের ধার দিয়ে নিয়ে চলল সে দুই গোয়েন্দাকে, পুরানো প্রেসিং হাউস, পরিত্যক্তই বলা চলে, খুব বেশি চাপ না থাকলে এখানে কাজ চলে না আজকাল।

আরও একশো গজ এগিয়ে, পশ্চিমের পাহাড় শ্রেণীর গোড়ায় ছায়া পাওয়া গেল। ঘোড়াগুলোকে ছায়ায় বেঁধে খেতে দেয়া হলো।

পর্বতের গা থেকে ছোট্ট একটা শাখা বেরিয়েছে ওখানে, শাখার গায়ে ঢাল কেটে ভারি একটা দরজা বসানো হয়েছে। দুই গোয়েন্দাকে দরজার সামনে নিয়ে এল মিঙ। 'এটাই সেই গুহা, যেটার কথা বলেছিলাম।' জোরে টান দিয়ে দরজাটা খুলল সে। ভেতরে অন্ধকার। 'আগে খেয়ে নিই, তারপর দেখাব সব কিছু।'

দরজার পাশে বসানো সুইচ বোর্ড, সুইচ টিপে দিল মিঙ। ক্লিক করে শব্দ হলো কিন্তু আলো জ্বলল না। 'ওহ্হো, ভুলেই গিয়েছিলাম, ডায়নামো বন্ধ। কাজ না চললে বন্ধই রাখা হয়। টর্চ জ্বালতে হবে।'

কোমরে ঝোলানো টর্চ খুলে নিয়ে জ্বালল মিঙ। লম্বা একটা করিডর দেখা গেল, দু'ধারে পাথরের দেয়াল, ছাত যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্যে কাঠের মোটা মোটা কড়িবর্গা লাগানো হয়েছে, দুই দিকেরই দেয়াল ঘেঁষে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে রাশি রাশি জালা। করিডরের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু লাইন, খানিক দূরে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ফ্ল্যাটকার।

'মদের জালা ফ্ল্যাটকারে তুলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয় দরজার কাছে,' বুঝিয়ে বলল মিঙ। 'লাইনের শেষ মাথায় ট্রাক দাঁড়ায়, তাতে বোঝাই করা হয় জালা।

লাইনের ওপর দিয়ে ফ্ল্যাটকার ঠেলে আনা খুবই সহজ, পরিশ্রম খুবই কম হয়, যত ভারি বোঝাই থাকুক না কেন।'

'বুঝলাম,' হাত তুলল মুসা। 'কথা আর না বাড়িয়ে আগে পেট ঠাণ্ডা করে নিলে কেমন হয়?'

পাথরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল মুসা আর রবিন, মিঙ বসল তাদের মুখোমুখি। লাঞ্চ প্যাকেট খুলল। মাত্র কয়েক ফুট দূরে, দরজার বাইরে অপরাহ্নের কড়া রোদ, তীব্র গরম, অথচ গুহার ভেতরে এখানে বেশ ঠাণ্ডা, যেন এয়ারকুলার লাগানো রয়েছে।

খেতে খেতেই মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে ওরা, পুরানো প্রেসিং হাউসটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, কিন্তু ওখান থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওদেরকে।

খাওয়া শেষ। হাত-পা ছড়িয়ে আরামে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা। নিজের জীবনের কথা বলছে মিঙ। কয়েকটা পুরানো গাড়ি এসে থামল পুরানো প্রেসিং হাউসের কয়েকশো গজ দূরে, নতুন প্রেসিং হাউসের সামনে।

জনা ছয়েক লোক নামল গাড়ি থেকে, সব ক'জনের বিশাল শরীর, শক্তিশালী। এক জায়গায় জমা হলো ওরা। কোন কিছুর অপেক্ষা করছে মনে হচ্ছে।

চুপ হয়ে গেছে মিঙ। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। 'দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? এমনিতেই লোক কম, আঙুর তোলা শুরু করছে না কেন?'

মরিসনের জীপ এসে থামল লোকগুলোর পাশে, লাফ দিয়ে নামল বিশালদেহী ফোরম্যান। প্রেসিং হাউসের দিকে চলল, তাকে অনুসরণ করল ছয়জন। সবাই ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দিল।

'মেশিন চালাবে বোধহয়,' বিড়বিড় করল মিঙ। 'তার ব্যাপার, যা খুশি করুকগে। লোকটাকে পছন্দ করি না, কিন্তু কাজ বোঝে। শ্রমিক সামলাতে তার জুড়ি কম। দুর্ব্যবহারও করে।' কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে আছে সে, রবিন আর মুসার দিকে তাকাল। 'খনির সুড়ঙ-টুড়ঙ দেখার ইচ্ছে আছে?'

আছে, জানাল দুই গোয়েন্দা। কোমরের বেল্টে ঝোলানো টর্চ খুলে নিল। তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আলগা পাথরে পা পিছলাল মুসা, পতন ঠেকাতে গিয়ে হাত থেকে ছুটে গেল টর্চ পাথুরে মেঝেতে পড়ে ঝনঝন শব্দ তুলল।

টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে রবিনের টর্চের আলোয় দেখল, কাঁচ আর বাল্‌ব্ ভেঙে গেছে! 'ইয়াল্লা। গেছে আমার টর্চ।'

'দুটোতেই চলবে,' বলল মিঙ, 'তবে...,' প্রেসিং হাউসের কাছে দাঁড়ানো জীপটার দিকে তাকাল, 'তবে, ইচ্ছে করলে মরিসনের টর্চটা নিতে পারি। গতরাতে যেটা ধার দিয়েছিল আমাকে। তার টুল বক্সে অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে রাখে। রাতের আগে ফেরত দিলেই চলবে। তোমরা থাকো, আমি গিয়ে নিয়ে আসি।'

বাধা দিয়ে মুসা বলল, 'তুমি থাকো, আমিই যাই। আমি ভেঙেছি, আনার দায়িত্ব আমার।'

কি ভাবল মিঙ, মাথা কাত করল, 'ঠিক আছে।' নোটবুক বের করে পাতা ছিঁড়ে তাতে নোট লিখল মরিসনকে, 'টর্চটা ধার নিচ্ছি। রাতের আগে ফেরত

দেব।—মিঙ। কাগজটা মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল। 'কাজের সময় বিরক্ত করা পছন্দ করে না সে। এই নোটটা টুলবক্সে রেখে এসো। যন্ত্রপাতি সব কোম্পানির, আমি লিখে দিয়েছি, কিছু মনে করার নেই তার।'

ঘোড়ায় চড়ে চষা খেতের ওপর দিয়ে চলল মুসা। দুই মিনিটেই পৌঁছে গেল জীপের কাছে। খেয়েদেয়ে আর বিশ্রাম নিয়ে আবার তাজা হয়ে উঠেছে ঘোটকী, চঞ্চলতা বেড়েছে, সামলাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে মুসার। নেমে রাশ ধরে রাখল শক্ত হাতে। আরেক হাতে খুলল জীপে রাখা টুলবক্সের ডালা। টর্চটা দেখা যাচ্ছে না। কয়েকটা যন্ত্রপাতি সরাতেই পাওয়া গেল ওটা, বাক্সের এক কোণে লুকিয়ে ছিল। তুলে নিল। পুরানো ধাঁচের বড় ভারি জিনিস, কালো প্লাস্টিকের খোল, পেছনে রিঙ বা লুপ জাতীয় কিছু নেই কোমরে ঝোলানোর জন্যে, অগত্যা কোমরের বেল্টের ভেতর গুঁজে রাখল সেটা।

নোটটা বাক্সে রাখল, ডালা তোলাই রইল, যাতে এসে প্রথমেই কাগজটা চোখে পড়ে মরিসনের। অনেক কায়দা কসরত করতে হলো ঘোড়ায় চড়তে, কিছুতেই পিঠে নিতে চাইছে না ঘোটকী।

বড় জোর একশো গজ এসেছে, এই সময় পেছনে চিৎকার শুনতে পেল মুসা। ফিরে তাকাল। জীপের কাছে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাত নাড়ছে মরিসন, চেঁচামেচি করছে। টর্চটা দেখাল মুসা, ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল নোট রয়েছে টুলবক্সে, ঘোড়া থামাল না।

লাফিয়ে জীপে উঠল মরিসন। চিৎকার শুনে প্রেসিং হাউস থেকে অন্য লোকগুলো বেরিয়ে এসেছে, দেখছে। আঙুরের ঝোপ দলে খেত মাড়িয়েই ছুটে আসতে লাগল জীপ। দরজা দিয়ে মুখ বের করে চিৎকার করছে ফোরম্যান, হাত নেড়ে থামার ইঙ্গিত করছে মুসাকে।

থামতে চাইছে মুসা, কিন্তু ঘোটকী কথা শুনছে না। চেঁচামেচিতে অস্বস্তি বোধ করছে বোধহয়। 'আরে থাম্ থাম্!' রাশ টেনে ধরল সে।

কাছে এসে থামল জীপ। খানিকটা পাশে সরে গেল ঘোটকী। বন্দুকের নল থেকে গুলির মত ছিটকে বেরিয়ে দৌড়ে এল মরিসন। 'চোর! চোর কোথাকার! ছাল ছাড়াব...।' রাগে বাক্য শেষ করতে পারল না, মুখে আটকে গেল।

ঘোটকী বোধহয় ভাবল, তাকেই গাল দিচ্ছে লোকটা, মারতে আসছে আকাশমুখী বিরাট এক লাফ মারল। আরেকটু হলেই পড়ে গিয়েছিল মুসা, খপ করে চেপে ধরল জিনের সামনের উঁচু শক্ত মাথাটা।

আবার চেঁচিয়ে উঠল মরিসন।

ঘাবড়ে গিয়ে ছুট লাগাল ঘোটকী, আঙুরের ঝোপ দলে দৌড় দিল পাহাড়ের ঢালের দিকে, অনেক চেষ্টা করেও থামাতে পারল না মুসা। কি আর করবে? দু'হাঁটু ঘোড়ার পেটের সঙ্গে চেপে রেখে, জিন আর রাশ একই সঙ্গে আঁকড়ে ধরে কোনমতে জানোয়ারটার পিঠে উপুড় হয়ে রইল সে।

grohon.com

নয়

দূর থেকেই দেখতে পেল মুসা, পাহাড়ের ঢালে সরু একটা পথ উঠে গেছে, বেশ খাড়া। সোজা সেই পথে এসে উঠল ঘোটকী। গতি সামান্য কমল, এই সুযোগে আরেকটু শক্ত হয়ে বসল মুসা। পড়ে যাওয়ার যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে ফিরে তাকাল একবার। জীপ নিয়ে তাড়া করে আসছে মরিসন। উঁচুনিচু খেতের ওপর দিয়ে সাংঘাতিক ঝাঁকি খেতে খেতে আসছে গাড়ি।

পাহাড়ী পথের গোড়ায় এসে থেমে গেল জীপ। লাফিয়ে নামল মরিসন, ঘুসি পাকিয়ে হাত ঝাঁকাতে লাগল মুসার দিকে।

রবিন আর মিঙকে বেরোতে দেখল মুসা। ঘোড়ায় চড়ল ওরা তাড়াহুড়ো করে, মুসার দিকে ছুটে আসতে শুরু করল। মরিসন আর তার জীপের পাশ কাটিয়ে ছুটে এল দ্রুত গতিতে, মিঙ আগে, রবিন পেছনে। সাংঘাতিক জোরে ছুটছে মিঙের কালো কোল্ট, মুসার ঘোটকীর সঙ্গে দূরত্ব কমছে।

একটা পাথরের পাশ কাটাতে গিয়ে জোরে মোচড় খেলো ঘোটকীর শরীর, কোনমতে দ্বিতীয়বার পতন রোধ করল মুসা। একটা মোটামুটি সমতল জায়গায় এসে আবার গতি বাড়াল ঘোড়া। পেছনে খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। খানিক পরেই মুসার পাশাপাশি হলো মিঙ। ঘোটকীর রাশ ছেড়ে দিয়েছে মুসা, বাতাসে উড়ছে ওটা, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল মিঙ। কোল্টের গতি কমাল ধীরে ধীরে, টানের চোটে ঘোটকীও গতি কমাতে বাধ্য হলো। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পড়ল দুটো ঘোড়া, নাক প্রসারিত, জোরে জোরে শ্বাস টানছে, চামড়া ঘামে ভেজা।

'ধন্যবাদ, মিঙ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুঝি ঘোটকীর বাচ্চা।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে মুসার দিকে চেয়ে আছে মিঙ।

'কি ব্যাপার? অমন করে দেখছ কেন?'

'ভাবছি,' মিঙ বলল, 'তোমার ঘোড়াকে তাড়া করল কেন মরিসন?'

'কি জানি! চেঁচামেচি শুরু করে দিল। চোর বলে গাল দিল। ভীষণ রেগেছে।'

'আসার সময় দেখলাম, ইবলিসের চেহারা হয়ে গেছে। রাগে হাত-পা ছুঁড়ছে। পকেটে রিভলভার আছে, র‍্যাটল সাপ মারার জন্যে দিয়েছে দাদীমা, ওটা প্রায় বের করে ফেলেছিল।'

'বুঝতে পারছি না,' মাথা চুলকাল মুসা। 'পুরানো একটা টর্চের জন্যে এই কাণ্ড কেন করল?' বেল্টে গোঁজা কালো জিনিসটা টেনে খুলে দেখল।

টর্চটার দিকে তাকিয়ে রইল মিঙ। 'ওটা…ওটা মরিসনের টর্চ নয়,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'মানে, টুলবক্সে কখনও দেখিনি এটা। গতরাতে আরেকটা দিয়েছিল।'

'আমি এটাই পেয়েছি। আর কোন টর্চ দেখিনি। তুমি বললে বলেই নিলাম…ও মন আচরণ করবে জানলে…'

'ভুলই করেছি,' বাধা দিয়ে বলল মিঙ। 'দেখি?' হাত বাড়াল সে।

টর্চটা দিল মুসা. হাতে নিয়ে দেখল মিঙ, ওজন আন্দাজ করল। 'হালকা। ভেতরে বোধহয় ব্যাটারি নেই।'

'তাহলে তো কোন কাজে আসছে না,' দারুণ বিরক্ত শোনাল মুসার কণ্ঠ। 'এমন একটা জিনিসের জন্যে এই কাণ্ড করল মরিসন? কেন?'

'হয়তো…,' রবিন দেখে থেমে গেল মিঙ।

টলোমলো পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল রবিনের নড়বড়ে বুড়ো ঘোড়া। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে, ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন হাঁপাচ্ছে রবিন। 'উফ, বেঁচেছি। আরেকটু হলেই গেছিলাম। একবার তো মনে হলো, হাঁটু ভেঙে আমাকে নিয়েই গড়িয়ে পড়বে ঘোড়া।…কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে?'

'এত রাগল কেন মরিসন, তাই ভাবছি,' বলতে বলতে প্যাঁচ ঘুরিয়ে টর্চের পেছনের ক্যাপ খুলে ফেলল মিঙ। ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে বের করে আনল তুলোট কাগজের ছোট একটা প্যাকেট। হাতের তালুতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। খুলল সাবধানে।

'গোস্ট পার্লস!' ভেতরের জিনিসটা দেখে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'মরিসন চুরি করেছিল!' রবিনও চেঁচাল।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল মিঙের। 'তাই তো মনে হচ্ছে। টর্চের ভেতর। বাহ, চমৎকার বুদ্ধি। পুরানো যন্ত্রপাতির বাক্সে বাতিল টর্চ, কেউ সন্দেহ করবে না। জীপের ভেতর নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কাছছাড়া করার ঝুঁকি নেয়নি।'

'হুঁ, ভাল জায়গায়ই লুকিয়েছিল,' বলল রবিন। 'আমাদের হঠাৎ টর্চের দরকার হবে, কল্পনাও করেনি।'

'ভাবছি, প্রেসিং হাউসে লোকগুলোকে নিয়ে কি করছিল?' মিঙের কণ্ঠে অস্বস্তি। 'এখন তো অনেক কিছুই সন্দেহ হচ্ছে। এই যে একের পর এক দুর্ঘটনা, পিপা ফুটো হওয়া, মেশিন ভেঙে যাওয়া, এসবে তার কোন হাত নেই তো?'

'থাকতেও পারে। চলো, তোমার দাদীমাকে গিয়ে সব খুলে বলি। শেরিফকে ডেকে এনে মরিসনকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন।'

'যত সহজ ভাবছ তত সহজ হবে না,' ধীরে ধীরে বলল মিঙ। 'মরিসন ডেনজারাস লোক। মরিয়া হয়ে উঠলে কি করবে বলা যায় না। আমাদের এখন বাড়ি ফিরতে দিলে হয়।'

'কি করবে?' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রবিন।

সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে বলল মিঙ, 'দেখা যাক কি করে? রবিন, তুমি ঘোড়াগুলো রাখো। আমি আর মুসা গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসি, নিচে কি হচ্ছে।'

তিনটে রাশ হাতে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে রইল রবিন।

মিঙ আর মুসা ফিরে চলল, যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে।

সমতল জায়গাটার কিনারে এসে ঝুঁকে নিচে তাকাল। পথের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক, পাহারায় রয়েছে যেন। ঝাঁকি খেতে খেতে গাঁয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে জীপটা। প্রেসিং-হাউসের কাছে দাঁড়ানো দুটো পুরানো গাড়ি স্টার্ট নিয়ে এগিয়ে এল খেতের ওপর দিয়ে, পাহাড়ী পথটাই বোধহয় লক্ষ্য।

সরু পাহাড়ী পথের কয়েকগজ ওপরে এসে থেমে দাঁড়াল আগের গাড়িটা

grohan.com

পেছনেরটা আড়াআড়ি ভাবে থামল পথের ঠিক গোড়ায়। উদ্দেশ্য বোঝা গেল, পথ রোধ করেছে। ঘোড়া নিয়ে গাড়ি দুটোকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না, যেতে হলে ডিঙিয়ে যেতে হবে, এবং সেটা সম্ভব নয়—আর কোন উপায় নেই!

দম আটকে আসছে যেন মিঙের। নিচু গলায় বলল, 'ঘোড়ার জন্যে গেছে মরিসন। আমরা যাতে পালাতে না পারি, সেজন্যে লোকগুলোকে রেখে গেছে।'

'তারমানে ফাঁদে ফেলেছে?'

'তাছাড়া আর কি? ওপথে ফিরে যেতে পারব না আমরা, এগিয়ে গিয়ে উল্টো পাশে হয়তো নামতে পারব, কিন্তু সহজ হবে না। নিচে হ্যাশনাইফ ক্যানিয়ন, গভীর একটা গিরিসঙ্কট তা-ও বক্স ক্যানিয়ন। এক দিক রুদ্ধ, আরেক দিক খোলা। খোলা দিক দিয়ে বেরোলে সরু একটা পথ পাওয়া যাবে, খুব খারাপ পথ, উঁচুনিচু, স্যান ফ্রানসিসকো যাওয়ার মেইন রোডের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

'কিন্তু ওর পথ ধরে গেলেও বাঁচতে পারব না। সহজেই ধরে ফেলবে আমাদেরকে মরিসন। ইতিমধ্যেও ওই পথের শেষ মাথায় পাহারা পাঠিয়ে দিয়েছি কিনা কে জানে। নেকলেসটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে সে, জানা কথা।'

'কিন্তু এসব করে পার পাবে না,' চেপে রাখা দম ফেলল মুসা। 'নেকলেসটা নিয়ে নেবে, কিন্তু আমরা তো বলে দেব।'

'ওকথা ভাববে না মনে করেছ?' মিঙের অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠ ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বইয়ে দিল মুসার শিড়দাঁড়ায়। 'আমাদের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করবে। যারা যারা এখানে দেখেছে আমাদের, সব মরিসনের লোক, কেউ মুখ খুলবে না।'

চুপ হয়ে গেল মুসা। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। ঢোক গিলল।

'এসো,' মুসার হাত ধরে টানল মিঙ। হঠাৎ হাসি ফুটল মুখে, কালো চোখের তারা উজ্জ্বল। 'একটা ফন্দি এসেছে মাথায়। গাঁয়ে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে ফিরতে মরিসনের সময় লাগবে। ওকে ফাঁকি দেব আমরা। জলদি করতে হবে। চলো।'

দৌড়ে ফিরে এল ওরা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে রবিন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বলল, 'কি ব্যাপার?'

'ফাঁদে আটকেছে আমাদের,' জানাল মুসা। 'নেকলেসটা ফেরত চায় মরিসন, সেইসাথে আমাদের মুখ বন্ধ করে দিতে চায়। লোকগুলো ওর সহকারী।'

'কিন্তু ওকে বোকা বানাব আমরা,' আশ্বাস দিল মিঙ। 'পাহাড়ের চূড়া লম্বালম্বি এগিয়ে গেছে, চূড়ার ওপর দিয়েই বক্স ক্যানিয়নের পাশ কেটে চলে যাব, তারপর নামব। আরেকটা গিরিপথ আছে।'

ঘোড়ায় চাপল আবার তিনজনে। আস্তে আস্তে চলল মিঙ, ঘোড়াগুলোকে ক্লান্ত করতে চায় না। তার পেছনে রইল রবিন, সবার পেছনে মুসা। তরুণ কোল্টের কোনরকম আড়ষ্টতা নেই, স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু নড়বড়ে বুড়িটার নড়ার ইচ্ছে নেই, খালি দাঁড়িয়ে পড়তে চাইছে! মুসার তরুণী মেজাজ মর্জিও বিশেষ সুবিধের নয়। যে কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তবু বাধ্য হয়ে ওগুলোতে চড়েই এগোতে হলো ওদের, যা পথ, পায়ে হাঁটা সম্ভব না।

যা-ই হোক, নিরাপদেই আধ ঘণ্টা পর পাথুরে গিরিপথে এসে নামল ওরা।

'হ্যাশনাইফ ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে ওদিকে গেছে পথটা,' হাত তুলে দেখাল মিঙ। 'মরিসনের ধারণা ওই পথ ধরে গিয়ে হাইওয়েতে উঠব আমরা। আসলে করব উল্টোটা।' ঘোড়ার মুখ ঘুড়িয়ে নিল সে, চলতে শুরু করল সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে। দু'পাশে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল। মাথার ওপরে আকাশের একটা অংশ শুধু দেখা যায়।

'দুটো হলুদ পাথরের দেখা পেলে এখন হয়,' বলল মিঙ, 'চিহ্ন। গিরিপথ থেকে বিশ ফুট ওপরে একটা, আরেকটা তার ওপরে।'

মিনিট দশেক একটানা চলল ওরা। তিনজনের মাঝে দৃষ্টি শক্তি বেশি তীক্ষ্ণ মুসার, সে-ই আগে দেখল পাথর দুটো। হাত তুলে বলল, 'ওই দুটো?'

মাথা ঝাঁকাল মিঙ। পাথর দুটোর নিচে এসে ঘোড়া থেকে নামল। 'নামো।'

দুই গোয়েন্দাও নামল। তাদেরকে অবাক করে দিয়ে ঘোড়াগুলোর গায়ে চাপড় মেরে বসল মিঙ। চমকে উঠে পেছন ফিরে দৌড়াতে শুরু করল কোল্ট, অন্য দুটো অনুসরণ করল তাকে।

'হাঁটতে হবে এখন,' বলল মিঙ। 'দরকার পড়লে ক্রলও করতে হতে পারে। গিরিপথ ওদিকে বন্ধ,' পেছনে দেখাল সে। 'এক জায়গায় ছোট একটা ডোবা আছে। পানির গন্ধ শুঁকে এগিয়ে যাবে ঘোড়াগুলো, পানি খেয়ে বিশ্রাম করবে ওটার পাড়েই। মরিসন যখন বুঝতে পারবে আমরা তাকে ফাঁকি দিয়েছি, খুঁজতে আসবে, ঘোড়াগুলো দেখবে, আমরা তখন কয়েক ঘণ্টার পথ দূরে।' ওপর দিকে তাকাল সে। 'ওখান দিয়ে একটা পথ গেছে জানি, অনেকটাই মুছে দিয়েছে পাথরের ধস। আমাদের জন্যে সুবিধেই। আশা করি উঠতে পারব ওখানে,' প্রথম হলুদ পাথরটা দেখল সে।

পাথরের খাঁজে খাঁজে হাত-পায়ের আঙুল বাধিয়ে উঠতে শুরু করল মিঙ। তাকে অনুসরণ করল রবিন। তার নিচে মুসা। এসব ব্যাপারে সে ওস্তাদ। নিজে তো উঠছেই, মাঝেমধ্যে নিচ থেকে ঠেলে উঠতে সাহায্য করছে রবিনকেও। দুই মিনিটেই উঠে এল ওরা হলুদ পাথরের কাছে। তাজ্জব হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, দুটো পাথরের মাঝে একটা বড় ফোকর। দ্বিতীয় পাথরটা আসলে ছাত সৃষ্টি করে রেখেছে গর্তের মুখে, বেশির ভাগটাই পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে প্রায় ঝুলে রয়েছে শূন্যে।

'গুহা,' বলল মিঙ। 'অনেক বছর আগে এক খনি-শ্রমিক স্বর্ণের লোভে খুঁজতে শুরু করে একাই। সুড়ঙ্গ কেটে ঢুকে যায় ভেতরে। ওখানেই ঢুকব আমরা।'

সুড়ঙ্গে নেমে গেল মিঙ। পেছনে নামল রবিন আর মুসা। গাঢ় অন্ধকারে এগিয়ে চলল অন্ধের মত। কিছুই জানে না কোথায় যাচ্ছে, কি আছে সামনে।

দশ

গুহার শেষ প্রান্তে নিয়ে এল দু'জনকে মিঙ। টর্চের আলোয় দেখা গেল বেশ বড় গুহা। এক জায়গায় একটা সুড়ঙ্গমুখ, আসলে পুরানো খনির গ্যালারি, বহু বছর আগে

grohon.com

খোঁড়া হয়েছিল। জায়গায় জায়গায় এখনও ছাত ঠেকা দিয়ে রেখেছে পুরানো কাঠের থাম, তবুও বেশ কিছু পাথর খসে পড়েছে ছাত থেকে।

'আমার প্ল্যান শোনো,' বলল মিঙ। 'আরও অনেক গ্যালারি আছে এই পাহাড়ের নিচে। প্রথম যখন এসেছিলাম, দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। এক বুড়ো আছে, ন্যাট বারুচ, এখানকার প্রতিটি ইঞ্চি চেনা তার। সারাটা জীবন এসব খনিতেই কাটিয়েছে, সোনা খুঁজেছে, মাঝে মাঝেই পেয়েছে ছোটখাটো টুকরো।

'বুড়ো এখন হাসপাতালে। বারুচই চিনিয়েছে আমাকে খনিগুলো। এই গুহা থেকে একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে একেবারে সেই গুহাটায়, যেখানে মদ চোলাই করা হয়। যেটাতে বসে খেয়েছি আমরা খানিক আগে।'

'সেরেছে! তাই নাকি?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। গুহার দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেশি করে কানে বাজল সে আওয়াজ। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল সে। 'তারমানে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা? বাহ্, কি মজা। ওপরে আমাদেরকে খুঁজছে মরিসন, ঘুণাক্ষরেও ভাবছে না আমরা তার নিচেই রয়েছি।'

'ঠিক তাই,' সায় দিল মিঙ। 'এভাবেই বাড়ির মাইলখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা, ওদের অলক্ষ্যে। গুহামুখে পাহারা রাখার কথা ভাববে না ওরা, সুযোগটা নেব আমরা। ওখান দিয়ে বেরিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি চলে যাব। তারপর আর ঠেকায় কে? দেব মরিসনের কীর্তি ফাঁস করে।'

মুক্তির কথা ভেবে আনন্দিত হলো রবিন, কিন্তু অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরে এতখানি যেতে হবে ভাবতেই কেমন জানি লাগছে। যদি আটকে যায়? যদি পাথর পড়ে সামনের পথ বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে? কিংবা যদি পথ হারায় মিঙ? তাহলে হয়তো আর কোন দিনই বেরোতে পারবে না মাটির তলায় এই গোলকধাঁধা থেকে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সবুজ চকের অস্তিত্ব অনুভব করল সে।

'চিহ্ন রেখে যাব নাকি?' বলল রবিন। 'তাহলে পথ হারালেও চিহ্ন দেখে আবার ফিরে আসতে পারব।'

'হারাব না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মিঙ। 'যদি মরিসন এসে ঢোকে এখানে? চিহ্ন দেখে সব বুঝে গিয়ে আমাদের পিছু নেয়? না, ওসবের দরকার নেই।'

নিজের ওপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস মিঙের। কিন্তু রবিন জানে, মানুষ যা আশা করে না, তাই ঘটে যায় অনেক সময়।

মুসা রবিনের সঙ্গে একমত। বলল, 'আমরা এমন চিহ্ন রেখে যাব খেয়ালই করবে না মরিসন। দেয়ালে চক দিয়ে আশ্চর্যবোধক এঁকে দেব, মাঝে মাঝে তীরচিহ্ন আঁকব, একেকবার একেক দিকে মুখ করে, কেউ বুঝবেই না আমরা কোন্ দিকে গেছি। আশ্চর্যবোধকগুলোকে গুরুত্ব দেবে না, তীরচিহ্ন ধরে একবার এদিক যাবে, একবার ওদিক, ঘুরে মরবে শুধু শুধু।'

'তা করা যেতে পারে,' মাথা দোলাল মিঙ। 'তবে এত ভাবনার কিছু নেই। এদিককার খনিগুলো চেনে না মরিসন, জানে না মদ চোলাইয়ের গুহাটার সঙ্গে যে এই গুহার যোগাযোগ আছে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, হুঁশিয়ার থাকা ভাল। বলা তো যায় না, যদি হারিয়ে যাই? তবে এই সুড়ঙ্গের মুখে চিহ্ন দেয়া চলবে না, তাহলে

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে কোনটাতে ঢুকেছি আমরা। ভেতরে ঢুকে তারপর চিহ্ন দেয়া শুরু করব।'

সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল ওরা। সরু পথ, মাঝে মাঝে ছাত এত নেমে এসেছে, মাথা ঠেকে যায়, নিচু হয়ে চলতে হয়। কোথাও কোথাও সুড়ঙ্গটাকে বেদ করে আড়াআড়িভাবে চলে গেছে আরও সুড়ঙ্গ, কিংবা মূল সুড়ঙ্গ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শাখা-সুড়ঙ্গ। ওই সব সুড়ঙ্গমুখে উল্টো পাল্টা তীর চিহ্ন এঁকে দিচ্ছে রবিন, যেটা ধরে যাচ্ছে, সেটার মাঝে মাঝে দেয়ালে আশ্চর্যবোধক আঁকছে, একবার এ পাশের দেয়ালে, একবার ওপাশের। এমনভাবে আঁকছে, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাবে যে কেউ, ওরা নিজেরা বাদে।

একটা জায়গায় খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এল সুড়ঙ্গ, তার ওপর পাথর ধসে পথ প্রায় রুদ্ধ।

থামতে বলল মিঙ। 'ক্রল করে যেতে হবে। আমি আগে যাই।' কোমরের বেল্টে গোঁজা কালো টর্চটা, যেটাতে নেকলেস ভরা আছে, সেটা টেনে খুলে মুসার হাতে গুঁজে দিল সে। 'এটা তোমার কাছে রাখো। পাথর আর মাটি সরিয়ে পথ করে নিতে হতে পারে। হারানোর ভয় আছে। যত্ন করে রাখো।'

মুসাও কোমরের বেল্টের ভেতর গুঁজে রাখল টর্চটা, বাকলেস আরও টাইট করে দিল, যাতে পড়ে না যেতে পারে মহামূল্যবান জিনিসটা। 'আমার হাতে আরেকটা টর্চ থাকলে ভাল হত।'

'তা হত,' স্বীকার করল মিঙ। 'দুটো আছে, এই অন্ধকারে আরেকটা থাকলে কাজে লাগত। রবিন, এক কাজ করো না, তোমারটা দিয়ে দাও মুসাকে। তুমি আমার পেছনে থাকো, তাহলে তোমার আর টর্চের দরকার পড়বে না। কি বলো?'

মাথা কাত করল বটে রবিন, কিন্তু মনে মনে মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটা। এই অন্ধকারে সব চেয়ে যেটা বেশি দরকার, সেটা আলো। কিন্তু অযৌক্তিক কথা বলেনি মিঙ, মুসার হাতে টর্চটা দিল রবিন। তারপর মিঙের পেছনে ক্রল করতে গিয়ে বুঝল, ঠিক কাজই করেছে। হাতে কিছু না থাকায় কাজটা সহজ হয়ে গেছে তার জন্যে।

সুড়ঙ্গের সরু অংশটা বড় জোর শ'খানেক গজ লম্বা, অথচ এটুকু পেরোতেই ওদের মনে হলো অসীম পথ, শেষ আর হতে চায় না। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে ওরা। রবিন আর মুসার অবস্থা যেমন তেমন, মিঙের অবস্থা কাহিল। সামনের পাথর দু'হাতে সরিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে তাকে। ধারাল পাথরে লেগে চামড়া কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেছে হাত।

দাঁড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে রবিনের। কিন্তু সোজা হয়ে বসারই উপায় নেই, দাঁড়াবে কিভাবে? একবার সেটা করতে গিয়ে অল্পের জন্যে বেঁচেছে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠতে চেয়েছিল, তাতেই বিপত্তি, কাঁধের ধাক্কায় ধসে পড়ল ছাতের আলগা পাথর, ঝরঝর করে পড়ে প্রায় ঢেকে দিল রবিনকে। আটকে গেল সে, নড়তে পারল না, পেছন থেকে এসে অনেক কষ্টে পাথর সরিয়ে তাকে মুক্ত করল মুসা।

'ধন্যবাদ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আতঙ্কিত রবিন। আর দাঁড়ানোর চেষ্টা

grohon.com

নয়।

অবশেষে চওড়া হতে শুরু করল সুড়ঙ্গ। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে হাঁপাতে লাগল ওরা। টর্চের আলোয় দেখা গেল, ছাতের কাঠের কড়িবর্গা পাথরের চাপে বাঁকা হয়ে গেছে, একটুখানি ঠেলা বা ধাক্কা লাগলেই ধসে পড়তে পারে তাহলে পাথরের তলায় জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে ওদের।

খানিকক্ষণ একই ভাবে বসে জিরিয়ে নেয়ার পর বলল মিঙ, 'সবচেয়ে খারাপ জায়গাটা পেরিয়ে এসেছি। সামনে আরেকটা আছে, তবে পেছনের মত এত খারাপ নয়। ওটা পেরোতে পারলেই...,' হাসল সে। 'একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। ওই পথে আমাদের পিছু নিতে পারবে না মরিসন, ওই সুড়ঙ্গে জায়গাই হবে না তার, গলে বেরিয়ে আসতে পারবে না, আটকে যাবে।'

বিশ্রাম নিতে নিতে খনির ইতিহাস বলল মিঙ। আঠারোশো উনপঞ্চাশ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় যখন স্বর্ণ আবিষ্কার হয়, তখন খোঁড়া শুরু হয় এই খনি। শুরুর দিকে সহজেই সোনা মিলতে লাগল, ফুরিয়ে আসার পর বেশির ভাগ শ্রমিকই চলে গেল অন্যত্র, কিন্তু কেউ কেউ রয়ে গেল, ওরা বেশি পরিশ্রমী। পাহাড়ের তলায় খুঁড়ে খুঁড়ে সুড়ঙ্গের জাল বানিয়ে ফেলল।

ভারড্যান্ট ভ্যালিতে তার আগে থেকেই আঙুরের চাষ হত। তারও অনেক পরে ওখানে আঙুরের খেত কিনলেন মিস দিনারা কৌনের মা।

তিরিশের দশকের পরেও টিকে ছিল কিছু কিছু খনিশ্রমিক, তারপর উনিশশো চল্লিশে আর সোনা পাওয়া গেল না, একে একে চলে গেল যারা তখনও ছিল। কেউ কেউ খনি খোঁড়া বাদ দিয়ে আঙুরের ফার্মে কাজ নিল।

'এখন আর সোনা আছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আছে, খুব অল্প। তবে সেটা তুলতে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি বলে কেউ আর এগিয়ে আসছে না,' বলল মিঙ। 'জিরানো হয়েছে। চলো, যাই।'

আবার এগোনোর পালা। দেয়ালে আশ্চর্যবোধক আর তীর চিহ্ন এঁকে চলল রবিন।

একটা জায়গায় এসে থমকে গেল মিঙ। কয়েকটা সুড়ঙ্গ এক জায়গায় মিলিত হয়েছে মূল সুড়ঙ্গের সঙ্গে। কোনটা দিয়ে যেতে হবে, ভুলে গেছে সে। অবশেষে ডানের একটা সুড়ঙ্গ বেছে নিয়ে তাতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ভুল করেছে। তিনশো গজ গিয়ে সরু হতে হতে মিলিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।

'ভুল পথে এসেছি,' টর্চের আলো জ্বেলে দেখছে মিঙ। সুড়ঙ্গের মেঝেতে এক জায়গায় আলো ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখো দেখো।'

দেখল রবিন আর মুসা। আলোয় মৃদু চকচক করছে শাদা হাড়। প্রথমে মনে হলো, মানুষের হাড়। কিন্তু ভাল মত দেখে বুঝল, কোন জানোয়ারের, বোধহয় আটকা পড়ে গিয়েছিল এখানে, ঢুকে কোন কারণে আর বেরোতে পারেনি, ক্ষুধাতৃষ্ণায় মরেছে।

'গাধার হাড়,' মিঙ বলল। 'মাল বওয়ার জন্যে নিয়ে আসা হত। হয়তো ধস

নেমে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বেরোতে আর পারেনি অসহায় জানোয়ারটা। লোকটার কি হয়েছিল কে জানে।'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল রবিনের। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল।

আবার আগের জায়গায় ফিরে এল ওরা। এবার সঠিক পথ বেছে নিল মিঙ। এগিয়ে চলল। তারও অনেক সুড়ঙ্গ উপসুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা জায়গায় এসে থামল মিঙ। তার গায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রবিন। 'কি হলো?'

'গলা,' জানাল মিঙ।

'গলা?' মুসা অবাক। 'কিসের গলা?'

'পাথরের মাঝের চিড়, খুব সরু আর রুক্ষ। প্রাকৃতিক। খনি আর গুহার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছে।'

ফাটলের মুখে আলো ফেলল মিঙ। ঠিকই বলেছে, খুবই সরু। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে ওর মধ্যে কোনমতে, কিন্তু সামনা-সামনি ঢুকতে পারবে না, পাশ থেকে ঢুকতে হবে। 'এটাই।'

'এর ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে?' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। 'শিওর?' ওই সরু ফাটলে ঢোকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার।

'শিওর,' বলল মিঙ। 'আগেও গিয়েছি। মুখের কাছে এসে দেখো। বাতাস লাগছে না? বাইরে থেকে আসছে।'

পরীক্ষা করে দেখল মুসা আর রবিন। ঠিকই। গালে ঝিরঝিরে বাতাসের স্পর্শ অনুভব করছে।

'ওর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে আমাদের,' আবার বলল মিঙ। 'আর কোন পথ নেই। আমরা এখনও গায়ে গতরে ছোট, তাই পারব। বড় কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আগে যাচ্ছি। তোমরা দাঁড়াও। ওপাশে গিয়ে তিনবার টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দেব, তারপর তোমরা আসবে। রবিন আসবে আগে। তারপর আবার তিনবার টর্চ জ্বাললে মুসা আসবে। ঠিক আছে?'

মাথা কাত করল দুই গোয়েন্দা।

ঢুকে গেল মিঙ। ডান হাতে টর্চ। খুব সাবধানে এক পা এক পা করে পাশে হেঁটে চলল। সামান্যতম বাড়তি নড়াচড়া করল না, কোনভাবে যদি কোন জায়গা থেকে এখন পাথর ধসে পড়ে, আর বেরোতে হবে না কোনদিন। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি।

রবিনের মুখ কালো। মুসার বুক দুরদুর করছে। বার বার আলো ফেলে দেখছে নিজের শরীর, তাকাচ্ছে সরু ফাটলটার দিকে, অনুমান করতে চাইছে, ফাটলে তার শরীর ঢুকবে কিনা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল, আর কখনও বেশি খাবে না, কোনমতে এখন এখান থেকে বেরোতে পারলে হয়, খাওয়া একেবারে কমিয়ে দেবে, যত লোভনীয় খাবারই সামনে থাকুক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছোঁবেও না। 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করতে লাগল সে।

কতক্ষণ অপেক্ষা করে আছে ছেলেরা, বলতে পারবে না, মনে হলো অনন্তকাল ধরে ফাটলটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবশেষে শেষ হলো প্রতীক্ষা, আলো

grohon.com

জ্বলল তিনবার। ওপাশে পৌঁছে গেছে মিঙ।

'রবিন, যাও,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। 'মিঙ যখন পেরেছে, তুমিও সহজেই পারবে। ওর চেয়ে তোমার শরীর অনেক ছোট, অনেক পাতলা। মুশকিল তো হবে আমার।'

'অত ভেব না,' সান্ত্বনা দিল রবিন। 'মিঙ যখন পেরেছে, তুমিও পারবে। ওর চেয়ে তুমি মোটা নও, একই রকম।' বন্ধুকে বলছে বটে, কিন্তু তার নিজের গলা-ই শুকিয়ে কাঠ। ঢোক গিলল। 'আলো দেখাও।'

পাশ ফিরে 'গলায়' ঢুকে পড়ল রবিন। একেবারে মুখের কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে আলো ফেলল মুসা। অন্য পাশ থেকেও আলো আসছে, টর্চ জ্বেলে রেখেছে মিঙ, রবিনের শরীরের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছে মুসা সেই আলো।

এগিয়ে যাচ্ছে রবিন। একটা সময় ওপাশের আলো আর দেখতে পেল না মুসা, রবিনের শরীর একেবারে ঢেকে দিয়েছে আলো। আরও কয়েক মুহূর্ত আলো জ্বেলে রাখল মুসা, তারপর যখন বুঝল মিঙের কাছাকাছি চলে গেছে রবিন, টর্চ নিভিয়ে দিল। অহেতুক ব্যাটারি খরচ করা উচিত নয় এখন।

আলোর সঙ্কেতের অপেক্ষায় রইল মুসা। কিন্তু কেন জানি দেরি হচ্ছে সঙ্কেত আসতে।

হঠাৎ শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার, 'মুসা-আ। খবরদার, এসো না...'

মিঙের কণ্ঠ, থেমে গেল আচমকা, যেন মুখ চেপে ধরা হয়েছে তার।

কিন্তু কি বলতে চেয়েছে মিঙ, বুঝতে পেরেছে মুসা, তাকে না যেতে বলেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। কিছুক্ষণ পর আলোর সঙ্কেত এল তিনবার, খানিক পরে আবার তিনবার। আলো দেখেই বোঝা গেছে, টর্চ ধরা হাতটা অস্থির। তাছাড়া রবিনকে ডাকার সময় প্রতিবারে যতক্ষণ করে আলো জ্বেলে রেখেছিল মিঙ, এখন তার চেয়ে কম সময় রেখেছে। এর মানে কি?

মিঙ বা রবিন আলোর সঙ্কেত দেয়নি, অন্য কেউ দিয়েছে।

তার মানে শত্রুর হাতে ধরা পড়েছে ওরা।

এগারো

এই সময় মিস কৌনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে কিশোর।

'ওদের কোন খবর নেই, বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন!' বললেন মিস কৌন। 'ঘোড়া নিয়ে গেছে। বলে গেছে, উপত্যকা ঘুরেফিরে দেখবে। সারাদিন আর পাত্তা নেই। এদিকে আমি পড়েছি এক মহা ঝামেলায়, রিপোর্টার, শেরিফ, ওদেরকে নিয়েই এত বেশি ব্যস্ত...। লোক পাঠিয়েছিলাম, অনেক খুঁজেছে। কিন্তু পাওয়া যায়নি ওদেরকে, এমনকি ঘোড়াগুলোও না।'

'কিন্তু গেল কোথায় ওরা?' নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর।

'আমার মনে হয় খনিতে ঢুকেছে। পাহাড়ের তলায় অনেক সুড়ঙ্গ আছে, ঢুকে হয়তো আর বেরোতে পারছে না। ওখানে খুঁজতে লোক পাঠাচ্ছি।'

নিচের ঠোঁটে একনাগাড়ে চিমটি কেটে চলেছে কিশোর। গোস্ট পার্ল চুরি

গেছে, এখন তার বন্ধুরা নিখোঁজ। নিশ্চয় কোথাও একটা যোগসূত্র রয়েছে। বলল, 'অনেক লোক পাঠাচ্ছেন তো?'

'নিশ্চই। শ্রমিক, যারা এখনও আছে, ভূতের ভয়ে পালায়নি, সব্বাইকে। এমনকি বাড়ির চাকর-বাকরও কয়েকজনকে পাঠাচ্ছি। ভারড্যান্ট ভ্যালির পরে যে মরুভূমি, সেখানেও পাঠিয়েছি কয়েকজনকে। তারা এখনও ফেরেনি।'

'যারা যাচ্ছে, তাদেরকে বলে দিন আশ্চর্যবোধক চিহ্ন খুঁজতে।'

'কি খুঁজতে?'

'আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। খনির দেয়ালে আঁকা থাকতে পারে। পেলেই যেন আপনাকে জানায়।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না...'

'ফোনে ব্যাখ্যা করতে পারব না,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'আমি আসছি। এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাবেন, প্লীজ? সঙ্গে রবিনের বাবাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠাব। ছেলেগুলোকে এখন ভালয় ভালয় ফিরে পেলে বাঁচি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। তারপর রবিনের বাবাকে ফোন করল। বাড়িতেই পাওয়া গেল তাঁকে। সব শুনে কিশোরের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, পত্রিকার একটা জরুরী কাজে বেরোচ্ছেন, এয়ারপোর্টে দেখা করবেন।

দ্রুত তৈরি হয়ে নিল কিশোর। বোরিসকে এসে জানাল মুসা আর রবিনের নিখোঁজ হওয়ার খবর। স্যালভিজ ইয়ার্ডের ভার তার ওপর দিয়ে রওনা হলো বিমানবন্দরে। বোরিসই ছোট ট্রাকটা নিয়ে তাকে প্লেনে তুলে দিয়ে আসতে চলল।

গাড়িতে বসে ভাবছে কিশোর। মিস দিনারা কৌন যত সহজ ভাবছেন, তত সহজে রবিন, মুসা আর মিঙকে পাওয়া যাবে বলে মনে হলো না তার।

কিশোরের অনুমান মিথ্যে নয়।

মদের বড় বড় দুটো জালায় ভরা হলো রবিন আর মিঙকে। ট্রাকে তুলে নিয়ে চলল মরিসন আর দলের লোকেরা। কোথায়, জানে না দু'জনে।

'গলার' এপাশে অন্ধকার গুহায় থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ মুসা। বুঝতে পারছে, রবিন আর মিঙকে যারাই বন্দি করে থাকুক, তারা বড় মানুষ, ফাটলে ঢুকতে পারবে না, নইলে এতক্ষণে ঢুকে পড়ত। সে এখন কি করবে?

এখানে থেকে লাভ নেই। আবার হ্যাশনাইফ ক্যানিয়নে ফিরে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে সকাল পর্যন্ত। তাদের খুঁজতে লোক নিশ্চয়ই পাঠাবেন মিস কৌন। তখন রবিন আর মিঙকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে।

নেকলেস ভরা টর্চটা কোমরের বেল্টেই গোঁজা রয়েছে, তাতে হাত বোলাল মুসা। মনে মনে আল্লাহকে ডাকল ঃ যেন হাতের টর্চটার ব্যাটারি না ফুরোয়, অন্তত সে না বেরোনোর আগে।

রবিনের কথা এইবার ফলল, কাজে লাগল চিহ্ন। সবুজ চকে আঁকা চিহ্ন ধরে ধরে ফিরে চলল সে। সত্যিই তীর আর আশ্চর্যবোধকের গোলকধাঁধা সৃষ্টি করে

grohon.com

রেখেছে রবিন, মুসাও একবার ভুল করে বসল। ভুল সুড়ঙ্গ ধরে চলে এল সেই গুহায়, যেটাতে গাধা মরেছে।

শাদা হাড়গুলোর ওপর একবার আলো ফেলেই ফিরল মুসা। পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। আচ্ছা, নেকলেসটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে কেন? যদি ধরা পড়ে যায়? তার চেয়ে লুকিয়ে রাখা কি ভাল নয়? ধরে ফেললেও হারটার লোভে ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হবে মরিসন।

হ্যাঁ, ভাল কথা মনে হয়েছে, তাই করবে সে। কিন্তু লুকাবে কোথায়? কোন পাথরের তলায়? না, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। সবগুলো পাথরই দেখতে প্রায় এক রকম। নিশানা ভুল করে ফেললে শেষে আর নিজেই খুঁজে বের করতে পারবে না। এমন কোথাও রাখা দরকার, যেখানে রাখলে ভুল করবে না, আবার, শত্রুরাও খুঁজে পাবে না সহজে।

কোথায় তেমন জায়গা? গাধার হাড়গুলোর ওপর আলো ফেলল সে আবার। ঘুরিয়ে এনে স্থির করল খুলিটার ওপর। হ্যাঁ, এটাই ঠিক জায়গা। খুঁজে পেতে তার কোন অসুবিধে হবে না,অথচ শত্রুরা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করবে না।

টর্চ থেকে খুলে হারটা কাগজের মোড়কমুক্ত করতে সময় লাগল না। খুলিটা উল্টে একটা খোড়লে নেকলেস ভরে আবার আগের মত করে ফেলে রাখল।

সঠিক সুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করায় মন দিল সে। এই সময় আরেকটা ভাবনা খেলে গেল মনে। খালি টর্চটা সঙ্গে বয়ে বেড়ানোর কোন কারণ নেই। তার চেয়ে···কথাটা কেন তার মনে এল, নিজেই বলতে পারবে না। কয়েকটা পাথর ভরে কোথাও লুকিয়ে রাখবে টর্চটা, সময়ে কাজে লেগেও যেতে পারে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কয়েকটা পাথর রেখে পোঁটলা করে ঠেসে ভরল টর্চের ভেতর। পেছনের ক্যাপটা আবার লাগিয়ে একটা পাথরের আড়ালে রেখে দিল টর্চটা। পাথরটার কয়েক ফুট দূরে ছোট ছোট পাথর দিয়ে একটা স্তূপ তৈরি করল, নিশানা। দরকার লাগলে এসে খুঁজে বের করে নিতে পারবে আবার টর্চটা।

সুড়ঙ্গ ধরে আবার চলতে শুরু করল মুসা। এসে পড়ল সেই সঙ্কীর্ণ জায়গাটায়। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। একটা জায়গায় এসে শুয়ে পড়ে ক্রল করে এগোতে হলো।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে রয়েছে পাহাড়ের তলায়। খালি হয়ে আসছে সেটা জানান দিতে শুরু করেছে পাকস্থলী। এই অন্ধকারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। আরেকবার প্রার্থনা করল সে, যেন টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে না যায়। তাড়াতাড়িও করতে পারছে না। জানে, যে অবস্থায় রয়েছে, তাড়াহুড়ো করলে, কিংবা মাথা গরম করলে, আরও বেশি বিপদে পড়ে যেতে পারে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরেসুস্থে কাজ করাই এখন বাঁচার একমাত্র উপায়।

টর্চ হাতে ক্রল করতে অসুবিধে হচ্ছে। বেল্টের পাশে জ্বলন্ত অবস্থায় ওটা গুঁজে রাখল সে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ খটাস করে তার মাথার সামনে পড়ল একটা পাথর, ছোট। চমকে উঠল সে। ভয়ে ভয়ে তাকাল মাথার ওপর নেমে আসা ছাতের দিকে। ধসে পড়ছে না

তো? এখানে ছাত ধসে পড়ার মানে জ্যান্ত কবর হয়ে যাওয়া। পেটের তলায় মাটিতে কম্পন অনুভূত হলো। দম বন্ধ করে পড়ে রইল সে, বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে।

যেমন সহসা শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল কম্পনটা। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে মাথার কাছ থেকে পাথরটা এক পাশে সরিয়ে দিল মুসা।

মিনিট খানেক চুপচাপ অপেক্ষা করল সে, তারপর আবার চলতে শুরু করল। কাঁপুনিটা কেন শুরু হয়েছিল, বুঝতে পেরেছে। কোথাও ছোটখাট ভূমিকম্প হয়ে গেছে, তারই রেশ এসে পৌঁছেছে এখানে।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রায় সবাই জানে, মুসাও জানে, বিখ্যাত স্যান অ্যানড্রিয়াস ফল্ট—পাথুরে ভূত্বকের এক মস্ত চিড়—চলে গেছে পশ্চিম ক্যালিফোর্নিয়ার নিচ দিয়ে। উনিশশো ছয় সালে ওই ফল্টের কারণেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল স্যান ফ্রানসিসকোয়। উনিশশো চৌষট্টি সালে আলাসকায় মহাভূমিকম্প ঘটিয়েছিল, ওটাই। সে সময় ওখানকার ভূপৃষ্ঠ কোথাও কোথাও তিনশো ফুট ঠেলে উঠেছিল, কোথাও বসে গিয়েছিল তার চেয়ে বেশি। প্রতি বছরই কমবেশি ভূমিকম্প হয় ওই ফল্টের কারণে, বছরে অসংখ্যবার, তবে তেমন মারাত্মক নয়।

জোরে জোরে দম নিচ্ছে মুসা। পেরিয়ে এল সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ। চিহ্ন ধরে ধরে চলে এল সেই গুহাটায়, যেটা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল।

গুহাটা খালি। নীরব। বাইরে অন্ধকারের কালো চাদর, রাত নেমেছে।

সাবধানে, নিশব্দে গুহামুখের দিকে এগোল সে। টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে। কয়েক কদম এগিয়েই থেমে কান পেতে শুনছে সন্দেহজনক শব্দ পাওয়া যায় কিনা। আশা করছে, এখনও গুহামুখটা খুঁজে পায়নি শত্রুরা।

গুহামুখের বাইরে বেরোল মুসা। তাকাল তারাজ্বলা আকাশের দিকে।

এই সময় পাথরের আড়াল থেকে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। শক্তিশালী বাহু জড়িয়ে ধরল তাকে, মুখ চেপে ধরল একটা কঠিন থাবা।

বারো

একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে মিশু আর রবিনকে। জানালা নেই, শুধু একটা দরজা, তা-ও তালা দেয়া, চেষ্টা করে দেখেছে দু'জনে, খুলতে পারেনি।

দু'জনেরই কাপড়ে বালি, ময়লা, সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দেয়ার সময় লেগেছে। ঝেড়েমুছেও বিশেষ সুবিধে হয়নি, সাফ হয়নি ময়লা। দু'জনেই গোসল করে নিয়েছে। শুধু তাই না, ভরপেট খেয়েছেও। চমৎকার রান্না করা চীনা খাবার।

খিদের জন্যে কথা বলার ইচ্ছেই হয়নি এতক্ষণ, পেট ঠাণ্ডা হতে আরাম করে বসে আলোচনা শুরু করল।

'আছি কোথায় কে জানে?' বলল রবিন, গত কয়েক ঘণ্টার উত্তেজনা অনেকখানি দূর হয়ে গেছে।

'বড় কোন শহরের তলায়,' বলল মিশু। 'স্যান ফ্রানসিসকো হতে পারে।'

'কি করে বুঝলে? চোখ বেঁধে এনেছে, আমি তো কিছুই দেখিনি, তুমি

grohon.com

দেখেছিলে?'

'না। অনুমান। মাঝে মাঝেই ছাত কেঁপে উঠছে, খেয়াল করছ না? ট্রাক যাচ্ছে ওপর দিয়ে। আর ট্রাক মানেই বড় শহর। চীনা চাকরেরা এই ঘরে নিয়ে এসেছে আমাদের, চীনা খাবার খাইয়েছে। সারা আমেরিকায় স্যান ফ্রানসিসকোতেই রয়েছে সবচেয়ে বড় চায়না টাউন। কোন মস্ত বড় লোকের বাড়িতে বন্দি হয়েছি আমরা।'

'কি করে জানলে?'

'খাবার। রান্না দেখোনি কি চমৎকার? এত ভাল রাঁধতে হলে খুব ভাল বাবুর্চি দরকার, আর সে-রকম বাবুর্চি রাখতে অনেক টাকা লাগে।'

'কিশোরের সহকারী তোমারই হওয়া উচিত ছিল,' আন্তরিক প্রশংসা করল রবিন। 'রকি বীচে থাকলে তোমাকে দলে নিয়ে নিত সে।'

'আমিও খুশি হয়ে যোগ দিতাম। ভারড্যান্ট ড্যালিতে বড় একা একা লাগে, আমার বয়েসী কেউ নেই তো। হংকঙে খুব আরামে ছিলাম; বন্ধুরা ছিল, কত খেলেছি। কিন্তু দাদীমার ওখানে···আর খেলার কথা ভেবে কি হবে, এখন হংকংও যা, ভারড্যান্ট ড্যালিও তা।'

মিঙের কথা বুঝতে পারছে রবিন। এখান থেকে বেরোতেই যদি না পারে, কোন জায়গা ভাল আর কোন জায়গা খারাপ, তা দিয়ে কি হবে?

দরজা খোলার শব্দে ভাবনায় বাধা পড়ল। এক বুড়ো চীনা, পরনে প্রাচীন চীনের পোশাক, দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

'এসো,' ডাকল লোকটা।

'কোথায়?' গম্ভীর হয়ে বলল মিঙ।

'বন্দির কোন প্রশ্ন করা উচিত নয়। এসো।'

দৃঢ়, বলিষ্ঠ পায়ে এগিয়ে গেল মিঙ, তাকে অনুসরণ করল রবিন।

বুড়ো চীনার পেছনে পেছনে লম্বা করিডর পেরিয়ে খুদে একটা লিফটে উঠল ওরা। অনেক উপরে উঠে একটা লাল দরজার সামনে থামল লিফট। দরজা খুলে পাশে সরে দাঁড়াল বুড়ো, হাত নেড়ে বলল, 'যাও। যা যা জিজ্ঞেস করা হবে, ঠিক ঠিক জবাব দেবে, যদি ভাল চাও।'

বিশাল এক গোল হলরুমে ঢুকল ওরা। দেয়াল ঢাকা মূল্যবান কাপড়ে, সোনালি সুতো দিয়ে সুচের নানা রকম কাজ ঃ ড্রাগন, চীনা মন্দির, উইলো গাছ, আর আরও নানারকম সুদৃশ্য ছবি। এক জায়গায় কিছু উইলো গাছ ঝড়ে দুলছে, একেবারে জ্যান্ত মনে হয়।

'খুব পছন্দ হয়েছে, না?' হালকা, বয়স্ক কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠস্বর। 'পাঁচশো বছর আগের তৈরি।'

ফিরে চেয়ে দেখল, ওরা একা নয়। কারুকাজ করা বিরাট এক কাঠের চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। কালো রঙ করা চেয়ার, কোমল পুরু গদি।

বৃদ্ধের পরনে ঢোলা আলখেল্লা, প্রাচীন চীনা সম্রাটরা যেমন পরতেন। ছোট্ট, হলদেটে মুখ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

'এগোও,' শান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি, 'খুদে বিচ্ছুর দল। অনেক ঝামেলা করেছ। বসো।'

গালিচার ওপর দিয়ে হেঁটে এল ছেলেরা, এত পুরু যে গোড়ালি ডুবে যায়। ছোট দুটো টুল আছে, ওদের জন্যেই এনে রাখা হয়েছে বোধহয়। বসল। অবাক হয়ে তাকাল বৃদ্ধের দিকে।

'আমি হুয়াঙ। বয়েস একশো সাত।'

বিশ্বাস করল রবিন ঃ এত বয়স্ক লোক আর দেখেনি। বয়েসের তুলনায় বেশ তাজা এখনও মিস্টার হুয়াঙ।

'খুদে ঝিঁঝি পোকা,' মিঙের দিকে চেয়ে বলল বৃদ্ধ, 'আমার দেশী রক্ত বইছে তোমার শরীরে। পুরানো চীনের কথা বলছি, আধুনিক চীন নয়। তোমার পূর্বপুরুষ মিশেছিল তাদের সঙ্গে। তোমার দাদার বাবা আমাদের রাজকুমারীকে নিয়ে এসেছিল। আসুক। মেয়েমানুষের ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, যাকে পছন্দ হয়েছে তার সঙ্গে এসেছে। কিন্তু তোমার দাদার বাবা জিনিস চুরি করেছিল। গোস্ট পার্ল।'

এই প্রথম উত্তেজনার চিহ্ন দেখা গেল তাঁর চেহারায়।

'মহামূল্যবান মুক্তোর একটা মালা,' আবার বললেন মিস্টার হুয়াঙ। 'প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর লুকানো ছিল জিনিসটা, আবার বেরিয়েছে। ওটা এখন আমার চাই-ই।' সামান্য সামনে ঝুঁকলেন। জোরাল হলো কণ্ঠ, 'শুনছ খুদে ইঁদুরের ছানা? মালাটা আমার চাই।'

ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে রবিন, কারণ, নেকলেসটা তাদের কাছে নেই। চাইলেই মিস্টার হুয়াঙকে দিয়ে দিতে পারছে না।

মিঙ বলল, 'জনাব, জিনিসটা আমাদের কাছে নেই। আরেকজনের কাছে। হরিণের গতি তার, সিংহের হৃদয়, নেকলেসটা নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয় চলে গেছে আমার দাদীমার কাছে। আমাদের বাড়ি যেতে দিন, দাদীমাকে বলব ওটা আপনার কাছে বিক্রি করে দিতে। তবে, আমার চীনা বড় মায়ের কোন আত্মীয় এসে যদি দাবি করে।'

'করবে না,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মিস্টার হুয়াঙের কণ্ঠ, 'কারণ তেমন কেউ নেই। অন্য লোকের কারসাজি রয়েছে এতে, ব্যাপারটা ঘোরাল করে নেকলেস দখল করতে চায়। খুব ধনী এক লোক, আমার চেয়ে অনেক ধনী। একবার ওর হাতে চলে গেলে আর আমি পাব না।'

বাউ করল মিঙ। মিস্টার হুয়াঙের সম্বোধন নকল করে নিরীহ কণ্ঠে বলল, 'আমরা খুদে ইঁদুরের ছানা, অসহায় বটে, কিন্তু আমাদের বন্ধু বাঘের বাচ্চা। ওর কাছে আছে নেকলেস। পালিয়ে যাবেই। ধনী লোকটার হাতে মালা পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।'

'মরবে!' চেয়ারের হাতলে টাট্টু বাজাল মিস্টার হুয়াঙের আঙুল। 'ওকে যারা পালাতে দেবে, তারা মরবে।'

'আমাদের প্ল্যান বুঝে ফেলেছিল আপনার লোক,' বলল মিঙ। 'ফাটলের

grohon.com

কাছাকাছিই ছিল। তবে আমার মুখ চেপে ধরার আগে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিতে পেরেছি আমার বন্ধুকে। তাকে আর ধরতে পারবে না। মরিসন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এত মোটা, ফাটলে ঢুকতেই পারবে না।'

'ঢুকতে তাদের হবেই,' বললেন মিস্টার হুয়াঙ। 'কাল রাতে নেকলেসটা হাতিয়ে নেয়ার পর টেলিফোন করল আমাকে মরিসন, জিনিস পাওয়া গেছে। তখনই হুঁশিয়ার করেছি, গোস্ট পার্ল হাতছাড়া করা চলবে না...'

থেমে গেলেন তিনি। কোথাও বেল বেজে উঠেছে। রবিনকে অবাক করে দিয়ে চেয়ারের গদির তলা থেকে ফোনের রিসিভার বের করে এনে কানে ঠেকালেন। চুপচাপ শুনে আবার রেখে দিলেন আগের জায়গায়।

'অবস্থার উন্নতি হয়েছে।'

নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন মিস্টার হুয়াঙ।

কি ব্যাপার? কৌতূহলে ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ছে রবিন। কি ঘটেছে? হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন কেন মিস্টার হুয়াঙ। তাঁর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা দেখিয়ে চমকে দিতে চাইছেন রবিন আর মিঙকে।

সম্ভব-অসম্ভব অনেক কথাই ভাবল রবিন, একটা কথা বাদে।

খুলে গেল লাল দরজা।

সারা গায়ে ধুলো-ময়লা, ফেকাসে চেহারা, টলোমলো পায়ে ঘরে এসে ঢুকল মুসা আমান।

তেরো

'মুসাআ!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন আর মিঙ। 'তুমি ঠিক আছ?'

'খুব খিদে লেগেছে,' করুণ হয়ে উঠল মুসার চেহারা। 'হাতটা ব্যথা করছে। মরিসনের বাচ্চা মুচড়ে ধরেছিল, নেকলেসটা কোথায় রেখেছি বলিনি, সে জন্যে।'

'হারটা তাহলে লুকিয়ে ফেলেছ?' উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'কাউকে বলোনি তো?' যোগ করল মিঙ।

'নাআ, বলিনি,' হাসি ফুটল মুসার চোখে। 'গুহায় লু...'

'চুপ!' চেঁচিয়ে উঠল মিঙ। 'বোলো না। শুনছে।'

নীরব হয়ে গেল মুসা। এই প্রথম চোখ পড়ল মিস্টার হুয়াঙের ওপর।

'তুমি খুদে ইঁদুর নও,' মিঙের দিকে চোখ ফেরালেন মিস্টার হুয়াঙ, 'ভুল বলেছি। তুমি একটা ড্রাগনের বাচ্চা, ঠিক তোমার দাদার-বাপের মত, হাড়ে হাড়ে শয়তান।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে কি ভাবলেন, তারপর তিন কিশোরকে অবাক করে দিয়ে যেন বোম ফাটালেন, 'তুমি আমার ছেলে হবে? পালকপুত্র? আমি ধনী, অনেক টাকার মালিক, কিন্তু আমার ছেলেপুলে নেই। তোমার মত একটা ছেলে পেলে...হবে? আমার সব সম্পদ দান করে দিয়ে যাব। আরামে কাটাতে পারবে বাকি জীবন।'

'হতে পারলে খুব খুশিই হতাম,' শান্ত কণ্ঠে বলল মিঙ। 'কিন্তু দুটো খারাপ কাজ করতে হবে আমাকে।'

'কি কি?'

'একঃ আমার বন্ধুদের সঙ্গে বেঈমানী করে গোস্ট পার্ল আপনার হাতে তুলে দিতে হবে।'

মাথা ঝোঁকালেন মিস্টার হুয়াঙ। 'আমার ছেলে হলে সেটা তোমার কর্তব্য।'

'দুই নম্বরঃ নেকলেসটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকথা আপনি ভুলে যাবেন, আমাকে পালকপুত্র করার ধারেকাছেও যাবেন না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার হুয়াঙ। 'আমি বলামাত্র যদি রাজি হয়ে যেতে, হয়তো ভুলে যেতাম। কিন্তু এখন? এখন সত্যিই তোমাকে ছেলে হিসেবে পেতে চাই।'

'না মিস্টার হুয়াঙ, মাপ করবেন। দুনিয়ার তাবৎ ধনের বিনিময়েও বন্ধুদের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারব না আমি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন মিস্টার হুয়াঙ, 'রাজি হলে ভাল করতে। যাকগে। মনের ওপর তো আর জোর চলে না। তবে দরকার হলে নেকলেস আমি জোর করেই আদায় করব।' গদির তলায় হাত দিয়ে চেয়ারে লাগানো গোপন কুঠুরি থেকে একটা ছোট বোতল, কাচের গেলাস আর গোল একটা জিনিস বের করে আনলেন। 'কাছে এসো, দেখে যাও।'

কাছে এসে দাঁড়াল তিন কিশোর।

মিস্টার হুয়াঙের বৃদ্ধ, শীর্ণ হাতের তালুতে ধূসর রঙের একটা গোল জিনিস, অনেকটা মার্বেলের মত, তবে অত মসৃণ নয়।

জিনিসটা চিনল মিঙ। 'একটা গোস্ট পার্ল।'

'ভুল নাম দেয়া হয়েছে জিনিসটার,' বলে বোতলের ছিপি খুলে তার ভেতর মুক্তোটা ফেলে দিয়ে ঝাঁকাতে লাগলেন মিস্টার হুয়াঙ। বুদবুদ উঠল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর গলে বোতলের তরল পদার্থের সঙ্গে মিশে গেল।

'এর নাম রাখা উচিত ছিল,' বোতলের তরল জিনিসটা গেলাসে ঢালতে ঢালতে বললেন মিস্টার হুয়াঙ, 'লাইফ পার্ল।'

গেলাসের তরল পদার্থটুকু এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন তিনি, যেন ওষুধ খেলেন, একটা ফোঁটাও রাখলেন না। গেলাসটা আবার রেখে দিলেন গদির নিচে গোপন কুঠুরিতে। 'একটা কথা অনেকেই জানে না,' বললেন তিনি, 'হাতে গোণা কয়েকজনে শুধু জানে, তারা সবাই ধনী, জ্ঞানী। দুনিয়ার লোক জানে গোস্ট পার্ল খুব দামী। কিন্তু কেন দামী জানে? জানে না। সাধারণ মুক্তোর মত সুন্দর নয় এই পার্ল, বরং কুৎসিতই বলা যায়। মনে হয় যেন মৃত কিছু। এজন্যেই এর নাম হয়েছে গোস্ট পার্ল।'

মিস্টার হুয়াঙ কি বলতে চাইছেন, কিছুই বুঝতে পারছে না তিন কিশোর, চুপ করে রইল ওরা।

'কয়েকশো বছরে,' বলে গেলেন বৃদ্ধ, 'মাত্র কয়েকটা গোস্ট পার্ল পাওয়া গেছে, ভারত মহাসাগরের একটা বিশেষ জায়গায়। সেটাও অনেক দিন আগের কথা, তারপর আর একটাও ওরকম মুক্তো পাওয়া যায়নি। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে মাত্র

grohon.com

ছ'টা গোস্ট পার্ল আছে, আর পাঁচটাই প্রাচ্যের লোকের কাছে, খুব কড়া পাহারায়। ওদের একেকজনের কত টাকা আছে, নিজেরাই জানে না। কিন্তু ওই কুৎসিত জিনিসগুলোর এত কদর কেন? কারণ,' নাটকীয় ভাবে থামলেন তিনি। 'ওই মুক্তো খেলে আয়ু বাড়ে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল তিন কিশোরের। যা বলছেন, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন বলেই বলছেন মিস্টার হুয়াঙ।

লম্বা দম নিয়ে আবার বললেন তিনি, 'শত শত বছর আগেই ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হয়েছে চীনে। প্রথমে জানত শুধু রাজ-রাজড়ারা, তারপর জানল বড় বড় জমিদারেরা, তারপর কিছু বড় ব্যবসায়ী—আমার মত লোকেরা। আমার বয়েস একশো সাত, এত দিন কি ভাবে বেঁচেছি জানো। মুক্তো খেয়ে, গোস্ট পার্ল, একশোটার মত খেয়েছি।' তাঁর কালো কুতকুতে চোখের তারা মিঙের ওপর নিবদ্ধ হলো। 'বুঝতে পারছ খুদে ড্রাগন, কেন নেকলেসটা আমার চাই? একেকটা মুক্তো তিন মাস করে আয়ু বাড়ায়, নেকলেসটাতে আছে আটচল্লিশটা মুক্তো, তার মানে আরও বারো বছর বাড়তি জীবন!' কণ্ঠস্বর চড়ছে তাঁর। 'মুক্তোগুলো আমার চাই, যে করেই হোক, কিছুই আমাকে ঠেকাতে পারবে না। আমার পথে বাধা হলে ধুলোর মতই ঝেড়ে ফেলে দেব তোমাদেরকে। আরও বারো বছর জীবন...বুঝতেই পারছ কত মূল্যবান আমার জন্যে।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল মিঙ। মুসা আর রবিনের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'ফালতু হুমকি দিচ্ছে না। যা বলছে, করবে। দেখি দর কষাকষি করে।'

'দর কষাকষি করবে?' শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর মিস্টার হুয়াঙের, মিঙের কথা সব শুনেছেন। 'ঠিক প্রাচ্যের লোকের মত কথা বলেছ। ন্যায্য দর কষাকষিতে উভয় দিকই রক্ষা হয়। বলে ফেলো।'

'নেকলেসটা কোথায় আছে, মুসা যদি বলে, কিনে নেবেন? না না, আমার জন্যে বলছি না, টাকাটা দাদীমাকে দেবেন?'

মাথা নাড়লেন মিস্টার হুয়াঙ। 'টাকা দিয়ে দিয়েছি মরিসনকে, তাকে দেব বলেছিলাম, দিয়েছি। তবে,' মিঙের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে করতে বললেন, 'একটা কাজ করতে পারি। তোমার দাদীমা আঙুর খেত আর মদের কারখানা আমার কাছে বন্ধক রেখেছে। আমি তোমার দাদীমাকে সময় বাড়িয়ে দিতে পারি টাকা শোধ করার জন্যে, ছোট ছোট কিস্তিতে দেয়ার পরামর্শ দিতে পারি। কথা দিতে পারি, ভূতটা আর দেখা দেবে না। শ্রমিকেরা ফিরে এসে কাজে লাগবে, তোমার দাদীমা ভরাডুবির হাত থেকে রেহাই পাবে।'

চোখ মিটমিট করল তিন কিশোর।

'কার ভূত জানেন তাহলে?' চেঁচিয়ে উঠল মিঙ। 'কি করে জানলেন।'

মৃদু হাসলেন মিস্টার হুয়াঙ। 'ছোট ছোট অনেক বিদ্যেই জানা আছে আমার। নেকলেসটা কোথায় আছে মরিসনকে দেখিয়ে দাওগে, তোমার দাদীমার সব দুঃখ শেষ।'

'শুনতে ভালই লাগছে,' মাথা ঝোঁকাল মিঙ। 'কিন্তু বিশ্বাস কি?'

অবচেতনভাবে রবিন আর মুসাও মাথা ঝোঁকাল, এই প্রশ্ন তাদের মনেও।

'আমি মিস্টার হুয়াঙ,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর, 'আমার দেয়া কথা ইস্পাতের চেয়েও শক্ত।'

'ওনাকে জিজ্ঞেস করো, মিঙ,' বলল রবিন, 'মরিসনকে বিশ্বাস কি?'

'ঠিক,' সায় দিল মুসা। 'মরিসন যা বলে, করে ঠিক তার উল্টো। কেউটে সাপকে বরং বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু ওকে নয়।'

দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন মিস্টার হুয়াঙ, 'মরিসনকে আসতে বলো।'

দীর্ঘ দুই মিনিট অপেক্ষা করে রইল ছেলেরা। খুলে গেল লাল দরজা। লিফট থেকে নামল মরিসন। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, হাবভাবে অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছে।

'মুখ খুলেছে?' ছেলেদের দিকে বুড়ো আঙুলের ইঙ্গিত করে মিস্টার হুয়াঙকে জিজ্ঞেস করল মরিসন।

'ভদ্রভাবে কথা বলো।' গর্জে উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ। 'ওদেরকে অবহেলা করবে না। তোমার মত নর্দমার কীট নয় ওরা। ড্রাগনের বাচ্চার সঙ্গে ক্রিমির যে-রকম ব্যবহার করা উচিত, তেমন ব্যবহার করো।'

রাগে লাল হয়ে গেল মরিসনের মুখচোখ, কিন্তু মিস্টার হুয়াঙের কালো চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ফেকাসে হয়ে গেল চেহারা, মড়ার মুখের মত ফেকাসে। 'স্যরি, মিস্টার হুয়াঙ, আমি জানতে চাইছিলাম।'

'তোমার চাওয়া না চাওয়ায় কিছুই এসে যায় না,' ধমকে উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ। 'যা হুকুম করব, পালন করবে। শোনো, আজ রাতে ওরা যদি নেকলেসটা তোমার হাতে তুলে দেয়, কোন ক্ষতি করবে না ওদের। বেঁধে রাখতে পারো, তবে খুব শক্ত করে নয়। এমনভাবে বাঁধবে, যাতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিজেরাই বাঁধন মুক্ত হতে পারে। ভালমত শুনে রাখো, ওরা একটা আঘাত পেলে, তোমাকে একশোটা আঘাত করা হবে। আমার আদেশ অমান্য করলে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হবে তোমাকে।'

কয়েকবার ঢোক গিলল মরিসন, তারপর বলল, 'ভারড্যান্ট ভ্যালিতে লোক গিজগিজ করছে, গরুখোঁজা খুঁজছে। অনেক কষ্টে ওদের নজর হ্যাশনাইফ ক্যানিয়ন থেকে অন্য দিকে সরাতে পেরেছি। ছেলেগুলোকে আবার ওখানে নিয়ে গেলে...'

'ওখানে ওদের কে নিতে বলেছে তোমাকে? নেকলেসটা কোথায় আছে জেনে নিলেই তো হয়। তারপর তোমার সুবিধেমত জায়গায় নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখো। এমন কোথাও যেখানে থেকে ওদের বাড়ি ফেরা সহজ হয়।'

উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ। ঢোলা আলখেল্লার নিচটা গাউনের মত ছড়িয়ে রইল। বসা অবস্থায় বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু এখন দেখা গেল, লম্বা নন তিনি, বেঁটেই বলা চলে, পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি।

'এসো,' মরিসনকে ডাকলেন তিনি। 'ওরা এখানেই থাকুক। নিজেদের মাঝে আলোচনা করে ঠিক করুক কি করবে। বুদ্ধি আছে ওদের, আমার ধারণা, ঠিক সিদ্ধান্তই নেবে।'

মিস্টার হুয়াঙের পেছনে বেরিয়ে গেল মরিসন।

grohon.com

চোদ্দ

'আস্তে কথা বলবে,' ফিসফিস করে বলল মিঙ। 'মুসা, নেকলেসটা কোথায়, উচ্চারণও করবে না। লুকানো মাইক্রোফোন নিশ্চয় আছে। অন্য কথা বলো, সময় নষ্ট কোরো।'

'নেকলেসটা লুকিয়ে কাজের কাজ করেছি,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল মুসা, 'অন্তত সময় তো পাওয়া গেল। নইলে তো গেছিলাম। ...তোমরা ধরা পড়লে কিভাবে?'

'লুকিয়েছিল ব্যাটারা,' বলল মিঙ। 'আমাকে বেরোতে দেখেছে। আমি রবিনকে টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিয়েছি, তা-ও দেখেছে। রবিন বেরোতেই এসে আমাকে আর রবিনকে জাপটে ধরেছে।'

'এবং গাধামী করেছে,' রবিন বলল। 'অপেক্ষা করা উচিত ছিল ওদের। মুসা বেরোলে তারপর ধরা উচিত ছিল।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'মিঙ চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করল। বুঝলাম, কিছু হয়েছে। তারপর টর্চ জ্বালল তিনবার, ওতেও গোলমাল লক্ষ্য করলাম। আর কি বেরোই!' হাসল সে। 'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, আমরা কোথায় আছি, সেটা জানল কি করে?'

'ঘোড়া নিয়ে এসে পাহাড়ে চড়েছিল মরিসন,' বলল মিঙ। 'আমাদেরকে হ্যাশনাইফ ক্যানিয়ন পেরিয়ে যেতে দেখেছে। অনুমান করে নিয়েছে আমরা কি করতে যাচ্ছি। ওর জানা আছে গলাটার কথা।' বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'আমি ভেবেছি আমি খুব চালাক। অথচ সোজা এসে মরিসনের খপ্পরে পড়লাম।'

'আমাদেরকে ক্যানিয়ন পেরিয়ে যেতে না দেখলে ধরতে পারত না,' মুসা বলল, 'সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তোমার আর কি করার ছিল? যাকগে, যা হবার হয়েছে। একটা ব্যাপারে তো শিওর হলে, মরিসন বেঈমান। মেশিনপত্র সে-ই ভেঙেছে, ইচ্ছে করে, মদের পিপা ফুটো করে দিয়েছে। সব তার শয়তানী।'

'হ্যাঁ,' বলল মিঙ। 'ও আর ওর সাঙ্গোপাঙ্গরাই করেছে। কিন্তু কেন? এসব তো শুরু করেছে বছর খানেক আগে থেকে, ভূত দেখা যায়নি তখনও। ভারড্যান্ট ভ্যালিতে গোস্ট পার্লের কথা ওখানকার কেউ জানত না তখন।'

'নিশ্চয় আছে কোন কারণ,' বলল রবিন। 'আমাদেরকে কিভাবে এনেছে, শোনো। পিপায় ভরে ট্রাকে করে এনেছে। একটা জায়গায় এসে থামল ট্রাক, মরিসনের সঙ্গে কথা বলল কয়েকজন লোক। কথাবার্তায়ই বুঝলাম, তাদেরকে পাঠিয়েছেন মিঙের দাদীমা, আমাদের খুঁজতে। ওরা নিশ্চয় কল্পনাও করেনি, ওদের কয়েক হাতের মধ্যেই রয়েছি আমরা।'

'চেঁচালে না কেন?' বলল মুসা।

'মুখ বেঁধে রেখেছিল,' বলল মিঙ। 'চালাক আছে মরিসন। মদের পিপায় মানুষ রয়েছে কে ভাববে? তাছাড়া তাকে সন্দেহও করে না কেউ। সে বলল, স্যান ফ্রানসিসকোর দিকে যাচ্ছে, আমাদের খুঁজতে। আমাদের না নিয়ে ফিরবে না। কাজেই তার অনুপস্থিতিতে সন্দেহ করবে না কেউ।'

'হুঁ, ব্যাটা চালাকই,' স্বীকার করল মুসা।

'স্যান ফ্রানসিসকোর পথে কয়েক মাইল চলল ট্রাক,' আবার বলল মিঙ, 'তারপর থামল। মদের পিপা থেকে বের করে একটা স্টেশন ওয়াগনে তোলা হলো আমাদের। পেছনে শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। আমার ধারণা, হ্যাশনাইফ ক্যানিয়নের দিকে যে আমরা গেছি তার সব চিহ্ন মুছে দিয়েছে মরিসন। ঘোড়াগুলোও নিশ্চয় সরিয়ে ফেলেছে ভেবেছিলাম, তোমাকে ধরতে পারবে না, কিন্তু ধরে ফেলল। নেকলেসটা ছিনিয়ে নেবে এখন!'

'তা পারছে না। নেকলেস আমি দেব না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মুসা।

'না দিয়ে পারবে না।'

'সেটা দেখা যাবে,' নিজের দুই হাতের দিকে তাকাল মুসা। 'আপাতত হাতমুখ ধোয়ার পানি যদি পেতাম, আর কিছু খাবার। পেট জ্বলছে। গুহায় বসে কি খেয়েছি না খেয়েছি, কখন হজম হয়ে গেছে। আর যা কষ্ট করেছি বেরোতে! ভাগ্যিস রবিন চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল, নইলে বেরোতেই পারতাম না।'

ফিসফিস করে বলল রবিন, 'যে দুটো পিপায় ভরা হয়েছিল আমাদেরকে, এক সুযোগে সে দুটোতেও চিহ্ন এঁকে দিয়েছি।'

'তাতে কি?' নিচু গলায় বলল মুসা। 'কিচ্ছু বুঝবে না কেউ। কিশোরও বুঝবে কিনা সন্দেহ।'

'ফিসফিসানি বাদ দাও,' বলল মিঙ। 'স্বাভাবিক গলায় কথা বলো, নইলে সন্দেহ করবে আমরা ফন্দি আঁটছি।'

'ফন্দি আর কি করব?' হতাশ ভঙ্গিতে দু'হাত নাড়ল মুসা। 'মিস্টার হুয়াঙের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া মুশকিল।'

'আমারও তাই ধারণা,' মাথা দোলাল মিঙ। 'বোঝাই যাচ্ছে, অনেক বড়লোক তিনি, প্রচণ্ড ক্ষমতা। একটাই উপায় আছে আমাদের, নেকলেসটা তাঁকে দিয়ে দেয়া।'

'এত সহজেই দিয়ে দিতে বলছ?' ভুরু কুঁচকাল মুসা। ভাবছে, কি কষ্ট করেই না লুকিয়েছে নেকলেসটা। এত কিছুর পর, মিস্টার হুয়াঙকে দিয়ে দিতে হবে?

'মুফতে তো দিচ্ছি না,' মুসার হতাশা দূর করার চেষ্টা করল মিঙ। 'মিস্টার হুয়াঙ কথা দিয়েছেন, আমাদেরকে মুক্তি দেবেন। তাঁর কথা বিশ্বাস করি। তাছাড়া দাদীমার কষ্টও কমবে, ধীরেসুস্থে ঋণ শোধ করতে পারবে! এর বেশি আর কি চাই আমরা।'

'তা-ও বটে। আচ্ছা, সত্যি কি বিশ্বাস হয়, মুক্তো আয়ু বাড়াতে পারে? আমার কাছে পাগলামি মনে হচ্ছে।'

'আমি অবিশ্বাস করছি না। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যি হতে পারে। চীনের ওষুধ-বিদ্যা অনেক পুরানো। ইদানীং পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, বিশেষ এক ধরনের ব্যাঙের চামড়ায় মূল্যবান ওষুধ হয়, অথচ শত শত বছর আগেই এটা জানা ছিল চীনের কবিরাজদের। বাঘের গোঁফ আর দানবের হাড়ের গুঁড়ো অনেক জটিল রোগের মহৌষধ, এটা অনেক আগে থেকেই বিশ্বাস করে চীনারা।'

grohon.com

'আমিও পড়েছি এ-ব্যাপারে,' বলল রবিন। 'ওই দানবরা হলো প্রাগৈতিহাসিক ম্যামথ, সাইবেরিয়ার দাঁতাল বাঘ আর কিছু প্রকাণ্ড প্রাগৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ার।'

'এখন কথা হলো, ওসবে যদি রোগ সারে, ভূতুড়ে মুক্তোই বা কেন আয়ু বাড়াবে না?' প্রশ্ন রাখল মিঙ। 'মিস্টার হুয়াঙ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন এটা, আর শুধু বিশ্বাসই অনেক সময় জটিল রোগ সারিয়ে দেয়, এটা তো এখন বৈজ্ঞানিক সত্য।'

'আচ্ছা, সবুজ ভূতের ব্যাপারে সত্যি সব জানেন মিস্টার হুয়াঙ?' বলল রবিন। 'একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে। প্রায় একই সময়ে একই জায়গায় উদয় হলো সবুজ ভূত আর ভূতুড়ে নেকলেস!'

'ওসব ভেবে লাভ নেই,' বলল মিঙ। 'নেকলেসটা দিয়ে দিচ্ছি এ ব্যাপারে তাহলে একমত আমরা?'

মাথা কাত করল মুসা আর রবিন।

গলা চড়িয়ে ডাকল মিঙ, 'মিস্টার হুয়াঙ, সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।'

এক জায়গায় কাপড় সরিয়ে বেরিয়ে এলেন মিস্টার হুয়াঙ, সঙ্গে তিনজন চাকর। কাপড়ের পেছনে ওখানে চার-চারজন মানুষের লুকানোর জায়গা থাকতে পারে, বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না।

'কি সিদ্ধান্ত নিলে, খুদে ড্রাগন?' জানতে চাইলেন মিস্টার হুয়াঙ, হয়তো আড়ালে থেকে সবই শুনেছেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না।

'নেকলেসটা দেব।'

'কোথায় আছে ওটা?'

'খনিতে,' জবাব দিল মুসা।

মরিসনকে ডেকে আনালেন মিস্টার হুয়াঙ। 'ও গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। ততক্ষণ তোমরা এখানে আমার মেহমান। নেকলেসটা পেলে তোমাদের ছেড়ে দেব। বাঁধার আর দরকার হবে না। ফিরে গিয়ে পুলিশকে হয়তো বলবে আমার কথা, কিন্তু লাভ হবে না। আমাকে খুঁজে পাবে না ওরা, হাওয়ায় মিলিয়ে যাব। আমেরিকার এই বিশাল চায়না টাউনেও আমি একটা বিরাট রহস্য, এখানকার যে কোন চীনাকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝবে।'

'মরিসন আনতে পারবে না খনি থেকে,' বলল মুসা। 'ও খুব বেশি মোটা। সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবেই না তার শরীর, বোতলের গলায় ছিপির মত আটকে যাবে,' ফোরম্যানের দিকে চেয়ে মুচকি হাসার লোভ সংবরণ করতে পারল না সে।

'রোগাটে লোক জোগাড় করতে পারব...', বাধা পেয়ে থেমে গেল মরিসন। হাত তালি দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলেন মিস্টার হুয়াঙ। 'নাআ! তোমাকে আনতে হবে। আর কাউকে বিশ্বাস করি না। যেভাবে পারো ঢুকবে।'

'খুদে ব্যাঘ্রশাবক,' মুসার দিকে ফিরে বললেন তিনি, 'সুড়ঙ্গটা কতখানি সরু? সত্যিই ঢুকতে পারবে না হোঁতকাটা?'

'না স্যার, সত্যি পারবে না,' বলল মুসা।

'নেকলেসটা টর্চের মধ্যে?'

'হ্যাঁ,' ঢোক গিলল মুসা।

'টর্চটা কোথায়?'

'পাথরের আড়ালে।'

'কোন জায়গায়?'

'কোথায় বলতে পারব না, তবে খুঁজে বের করতে পারব। ম্যাপট্যাপ কিছু এঁকে রাখিনি।'

'হুঁ,' ভাবলেন মিস্টার হুয়াঙ। মরিসনের দিকে ফিরে বললেন, 'সহজ হয়ে গেল। ওদেরকে নিয়ে যাও। মুসা টর্চটা বের করে দেবে।'

'কিন্তু তাতে বিপদ আছে,' বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে মরিসনের কপালে। 'ওদের খোঁজা হচ্ছে, যদি দেখে ফেলে...'

'ঝুঁকি নিতেই হবে। আগে সাবধান থাকোনি, তাই বিপদে পড়েছ। কিভাবে সামলাবে সেটা তোমার ব্যাপার। একটা কথা, ছেলেদের কোন ক্ষতি করা চলবে না।'

'কিন্তু ফিরে গিয়ে সব জানিয়ে দেবে ওরা।'

'জানাক। আমি তোমাকে রক্ষা করব। নিরাপদে বের করে দেব দেশের বাইরে। তোমার সহকর্মীরাও গায়েব হয়ে যাবে, পুলিশ খুঁজে পাবে না। আমাকে তো পাবেই না। কাজেই ওরা বললেও কিছু এসে যায় না। বুঝেছ?'

জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে মরিসন। 'হ্যাঁ, স্যার,' গলা কাঁপছে। 'আপনার কথামতই কাজ হবে। কিন্তু ছেলেরা যদি আমার সঙ্গে বেঈমানী করে?'

হাসলেন মিস্টার হুয়াঙ। 'সেক্ষেত্রে আমার আর কোন দায়িত্ব থাকবে না। ওদেরকে যা খুশি করতে পারো। তোমার নিরাপত্তার পথ তুমি বেছে নেবে। তবে আমার মনে হয় না ওরা কোন চালাকি করবে। প্রাণের মায়া কার না আছে? এই বুড়ো বয়েসেও আমার বেঁচে থাকার সাধ, আর ওরা তো শিশু।'

মিস্টার হুয়াঙের কণ্ঠে কিছু একটা রয়েছে, শিউরে উঠল রবিন। মনে মনে সে আশা করল, সত্যি কথাই বলেছে মুসা, নেকলেসটা খুঁজে বের করতে পারবে।

মুসা ভাবছে, মিস্টার হুয়াঙকে মিথ্যে কথা বলেছে সে, এর পরিণতি কি হবে?

'জলদি করো,' মরিসনকে তাড়া দিলেন মিস্টার হুয়াঙ, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'ওদের বেঁধে নিই...,' বাধা পেয়ে আবার থেমে গেল মরিসন।

ধমকে উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ, 'নাআ! তার দরকার হবে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাবে ওরা। আরামে যাবে।' মিঙের দিকে ফিরলেন। 'খুদে ড্রাগন, তাকাও তো আমার দিকে।'

মিস্টার হুয়াঙের চোখের দিকে তাকাল মিঙ, আটকে গেল দৃষ্টি, চেষ্টা করেও আর সরাতে পারল না।

একঘেয়ে কণ্ঠে বলে চললেন মিস্টার হুয়াঙ, 'খুদে ড্রাগন, তুমি ক্লান্ত, খুব ক্লান্ত। ঘুম পেয়েছে তোমার, অনেক ঘুম। কোমল হাতে তোমার চোখে পরশ বুলাচ্ছে ঘুম, ঘুমের রাজ্যে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছ তুমি, তোমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।'

অবাক হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, সত্যিই চোখ বন্ধ হয়ে আসছে মিঙের।

ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে মিঙ। জোর করে টেনে খুলল চোখের পাতা।

আবার শুরু হলো একঘেয়ে কণ্ঠ, 'চোখ বন্ধ হয়ে আসছে! বাধা দিতে পারছ না তুমি, আমার ইচ্ছেই তোমার ইচ্ছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে তোমার, বন্ধ করো, বন্ধ,...বন্ধ...বন্ধ...'

পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল মিঙের চোখের পাতা। খুলতে পারছে না।

মোলায়েম একঘেয়ে কণ্ঠ থামল না মিস্টার হুয়াঙের, 'ঘুম আসছে তোমার চোখ জুড়ে। গভীর ঘুম। অন্ধকারের চাদর গ্রাস করছে তোমাকে। ঘুমের দরিয়ায় তলিয়ে যাচ্ছ তুমি। তোমার ইচ্ছাশক্তিকে দাবিয়ে দিয়েছে ঘুম। ঘুমিয়ে পড়ছ তুমি। ঘুমিয়ে থাকবে, আমি না বললে জাগবে না। খুদে ড্রাগন, শান্তিতে ঘুমাও এখন...ঘুমাও...ঘুমাও...ঘুমাও...ঘুমাও...'

হঠাৎ টলে পড়ে যেতে শুরু করল মিঙের শরীর। লাফিয়ে এসে ধরে ফেলল তিন চাকর। একটা সোফায় শুইয়ে দিল।

'খুদে ব্যাঘ্রশাবক, এবার তুমি তাকাও আমার দিকে,' বললেন মিস্টার হুয়াঙ।

দুরুদুরু করছে মুসার বুক। না তাকিয়ে পারল না। একবার চেয়ে আর দৃষ্টিও সরাতে পারল না কোনদিকে। জোর করে ঘুম ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করল না মুসা, কেমন একটু যেন মজা পাচ্ছে, দেখি না কি হয় ভাব। অবশ করে ফেলছে যেন তাকে মিস্টার হুয়াঙের একঘেয়ে মোলায়েম কণ্ঠ। এক সময় সে-ও টলে পড়ে যেতে শুরু করল, তাকেও ধরে শুইয়ে দিল চাকরেরা।

রবিন বুঝতে পারছে, মিঙ আর মুসাকে সম্মোহন করেছেন মিস্টার হুয়াঙ। সে বইয়ে পড়েছে, রোগীকে সম্মোহন করে ঘুম পাড়িয়ে অপারেশন করা সম্ভব, কোন ব্যথা নাকি অনুভব করে না রোগী। মুসার মত ভয় পেল না সে। তার পালা এল।

'শকুন্তহৃদয়, তাকাও আমার দিকে,' বললেন মিস্টার হুয়াঙ। 'তোমার ঘুম পেয়েছে, তোমার বন্ধুদের মতই। ক্লান্ত তুমি, ভীষণ ক্লান্ত, চোখ বন্ধ করো...'

চোখ বন্ধ করে ফেলল রবিন।

মিস্টার হুয়াঙের একঘেয়ে কণ্ঠ চলল থেমে থেমে।

পড়ে যেতে শুরু করল রবিন, তাকে ধরে ফেলল চাকরেরা।

মরিসনকে বললেন মিস্টার হুয়াঙ, 'কোন রকম গোলমাল করতে পারবে না ওরা। জায়গামত পৌঁছে ডাক দিও, জেগে উঠবে। নেকলেসটা নিয়ে ছেড়ে দেবে। আর যদি...'

অপেক্ষা করে রইল মরিসন।

'আর যদি,' বলেন মিস্টার হুয়াঙ, 'গোলমাল কিংবা চালাকি করে, গলা কেটে ফেলে দিও কোথাও।'

পনেরো

'আশ্চর্যবোধক চিহ্ন কেউ খুঁজে পায়নি?' বিস্মিতই মনে হচ্ছে কিশোরকে। এই খানিক আগে ভারড্যান্ট ভ্যালিতে পৌঁছেছে সে আর রবিনের বাবা।

জোরে জোরে মাথা নাড়লেন মিসেস দিনারা কৌন। 'না। পুরো উপত্যকায় খোঁজ করিয়েছি আমি। গাঁয়ে যত লোক আছে, সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, বাচ্চারাও বাদ যায়নি।'

'আশ্চর্যবোধক নিয়ে এত তোড়জোর কেন?' ভুরু নাচাল ডলফ টার্নার। মিসেস কৌনের মতই তাকেও খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ব্যাখ্যা করে বলল কিশোর।

'মরুভূমিতে চিহ্ন দেবে কোথায়?' বলল টার্নার। 'আমি শিওর, ওদিকেই গেছে ওরা। কাল ভোরেই প্লেন নিয়ে খুঁজতে পাঠাব। মরুভূমিতেই কোথাও পথ হারিয়েছে ওরা। খনিতে আটকা পড়লে বাইরে ওদের ঘোড়াগুলো অন্তত খুঁজে পাওয়া যেত।'

'তা ঠিক,' সায় দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড, বিষণ্ন কণ্ঠস্বর। 'হ্যাঁ, মিস কৌন, কিশোর আপনাকে কিছু বলতে চায়।'

অপেক্ষা করে রইলেন মিস কৌন আর টার্নার। মস্ত হলঘরে বসেছে ওরা, চারজনই শুধু, অন্য কেউ নেই।

'মিস কৌন,' নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল কিশোর, কথার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে বড়দের মত গম্ভীর করে তুলল চেহারাকে, 'সবুজ ভূতের ব্যাপার নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছি আমি। আমার দুই বন্ধু ওটাকে দেখেছে, চিৎকার শুনেছে। তদন্ত করে আমি জেনেছি, চিৎকারটা বাড়ির ভেতর থেকে আসেনি। খুব মজবুত বাড়ি, নিখুঁত করে তৈরি হয়েছিল, প্রায় সাউণ্ড প্রুফ, ভেতরের শব্দ বাইরে আসতে পারে না ভাল মত।

'একটা কথা আমাকে বলুন, ভূত যদি থেকেই থাকে, আর থাকে বাড়ির ভেতরে, শুধু চিৎকার করার জন্যে বাইরে আসবে কেন? আসেওনি। চিৎকারটা করেছিল আসলে মানুষে, আমাদেরই মত জলজ্যান্ত মানুষ। আরেকটা ব্যাপার, সে-রাতে যে ক'জন দেখতে গিয়েছিল, তারা কেউই শিওর নয়, দলে কতজন ছিল। কেউ বলছে ছয়, কেউ বলছে সাতজন। সবার কথাই ঠিক।

'চিৎকারটা ড্রাইভওয়ে থেকে শুনেছে ছয়জন, আর ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে থেকে শুনেছে একজন, সে-ই চিৎকার করেছিল। তারপর কোন এক ফাঁকে বেরিয়ে এসে যোগ দিয়েছে দলের সঙ্গে।'

'কিশোর ঠিকই বলেছে,' একমত হলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'আশ্চর্য! এই সহজ কথাটা আমার আর পুলিশ চীফের মাথায় এল না।'

মিস কৌন ভ্রূকুটি করলেন।

'কথায় যুক্তি আছে,' ভুরু কুঁচকে গেছে টার্নারের, 'কিন্তু এই কাণ্ড কেন করতে যাবে লোকে?'

'দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে,' জবাব দিল কিশোর। 'পুরানো বাড়িতে ওরকম চিৎকার শুনলে অবাক হবেই লোকে। তাছাড়া ওরকম কিছু একটা ঘটবে, আশাও করছিল ছয়জন মানুষ। বলতে গেলে, একরকম জোরজার করেই নিয়ে আসা হয়েছিল ওদের পাঁচজনকে।'

'হুঁ। সাজানো ব্যাপার,' বললেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'একেবারে,' বলল কিশোর। 'একজন লোক ডেকে এনেছিল পাঁচজনকে, চাঁদের

grohon.com

grohon.com

আলোয় পোড়ো বাড়ি দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। চাঁদের আলোর অ্যাডভেঞ্চারের লোভেই রাজি হয়ে গিয়েছিল পাঁচজন, ছয় নম্বর লোকটাকে সন্দেহ করেনি ওরা, ধরে নিয়েছে নতুন কোন প্রতিবেশী। তার সঙ্গী তখন লুকিয়েছিল ঝোপের ভেতরে। ড্রাইভওয়েতে দলটাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে।'

চোখ মিটমিট করছে টার্নার, কিশোরের কথা বোঝার চেষ্টা করছে যেন।

মিস দিনারা কৌনের চোখে বিস্ময়। 'কিন্তু…কিন্তু কেন? দুজন লোক কেন ওরকম করবে?'

'দলটাকে বাড়িতে ঢোকানোর জন্যে,' বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'যাতে ভূত দেখে গিয়ে খবরটা ছড়াতে পারে। ভাল ফন্দি এঁটেছিল।'

'আমার মনে হয় না,' প্রতিবাদ করল টার্নার। 'এসব অতিকল্পনা।'

'তাই? কিশোর, টেপটা চালিয়ে শোনাও ওঁকে।'

রেকর্ডার রেডিই করে রেখেছে কিশোর। চালিয়ে দিল। কুৎসিত চিৎকারে ভরে গেল ঘর। লাফিয়ে উঠলেন মিস কৌন, চমকে গেল টার্নার।

'এটা শুরু,' মোলায়েম গলায় বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'আরও কিছু আছে। সে-রাতে যারা যারা কথা বলেছিল, সবার কণ্ঠস্বর ধরা পড়েছে টেপে। চিনতে পারলে জানাবেন।'

ভারি-কণ্ঠের কথা শুনে হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন মিস কৌন। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, 'হয়েছে হয়েছে, আর শোনার দরকার নেই, বন্ধ করো। এই ডলফ, এ-তো তোমার গলা! ভারি করেছ ইচ্ছে করেই। সেই যে, কলেজে যখন পড়তে, নাটকে ভিলেনের অভিনয় করার সময় ওরকম করে কথা বলতে, আমি ভুলিনি।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর, 'মিস্টার টার্নারের গলা। প্রথমে ধরতে পারিনি, তবে চেনা চেনা লাগছিল। কৌন ম্যানসনে ওঁর কথা শুনেছি তো। বদলে ফেলেছিলেন, তবে পুরোপুরি পারেননি। সে-রাতে নকল গোঁফ পরেছিলেন তিনি। অন্ধকারে ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল। সহজেই বোকা বানিয়ে দিয়েছেন পাঁচজনকে।'

মুখ নিচু করে সোফায় বসে আছে টার্নার, পুরানো কাপড়ের একটা দোমড়ানো বাণ্ডিল যেন।

'চুপ করে আছ কেন, ডলফ?' বরফের মত শীতল মিস কৌনের কণ্ঠ। 'কিছু বলার থাকলে বলো।'

বার কয়েক ঢোক গিলল টার্নার, অযথাই নিজের হাতের তালুর দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর শুরু করল, 'গোলমালটা শুরু হয়েছে বছর দেড়েক আগে, যখন ঘোষণা করলেন, আপনার সব সম্পত্তি মিঙকে দিয়ে যাবেন। অথচ ও আসার আগে জানতাম, সব আমি পাব,' গুঙিয়ে উঠল সে। 'কারণ মিঙ না থাকলে আপনার সব সম্পত্তির মালিক আইনত আমিই হতাম। নিজের জিনিস মনে করে ওই আঙুর খেত আর মদের কারখানার উন্নতির জন্যে গাধার মত খেটেছি। অথচ শেষে কি হলো? মনে হলো, আমার জিনিস আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে,' থামল

সে।

'বলে যাও,' কঠিন কণ্ঠে বললেন মিস কৌন।

হাত দিয়ে কপাল মুছল টার্নার। 'সহ্য করতে পারলাম না। একটা ফন্দি আঁটলাম। বন্ধুবান্ধব আর ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা ধার করলাম খেত বন্ধক রেখে, নতুন মেশিনারি কিনলাম। মরিসন আর তার কয়েক দোস্তকে টাকা খাইয়ে বশ করলাম, আমার হয়ে গোলমাল পাকাতে লাগল ওরা, যন্ত্রপাতি ভাঙতে লাগল, পিপায় ফুটো করে মদ ফেলে দিল। ক্ষতি করে করে এমন অবস্থায় নিয়ে আসতে চাইলাম, যাতে ভারড্যান্ট ভ্যালির সবকিছু বিক্রি করে আপনি কৌন ম্যানশনে চলে যেতে বাধ্য হন।'

'হুঁ, তুমিই আমাকে কৌন ম্যানশন বিক্রি করতে বাধ্য করেছ, এখন বুঝতে পারছি। বলে যাও।'

গভীর আগ্রহে শুনছে কিশোর। চিৎকারটা কার, বুঝেছিল সে, অনুমান করেছিল, টার্নার কোন না কোনভাবে জড়িত, কিন্তু কিভাবে, সেটা জানত না।

'বাড়ির অনেক দাম উঠল,' আবার বলল টার্নার, 'এত উঠবে কল্পনাও করিনি। বুঝলাম, ওই টাকা দিয়ে ঋণের বেশির ভাগই শোধ করে ফেলতে পারবেন। কি করব ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েছি, এই সময় একটা মেসেজ এল।'

'মেসেজ?' বলে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কি মেসেজ?'

'স্যান ফ্রানসিসকোয় যেতে হবে একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। গেলাম। বৃদ্ধ এক চীনা, তাঁর নাম মিস্টার হুয়াঙ। চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাকে, তাই কোন পথে গেছি বলতে পারব না। তিনি আমাকে জানালেন, ব্যাংকের কাছে রাখা ভারড্যান্ট ভ্যালির মর্টগেজ তিনি কিনে নিয়েছেন। বন্ধুবান্ধব যাদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলাম, তাদের সব টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে। শুধু তাই না, মুখ বন্ধ রাখার জন্যে বাড়তি টাকাও দিয়েছেন তাদেরকে।'

'কেন? তার কি লাভ?' জিজ্ঞেস করলেন মিস কৌন।

'আসছি সে কথায়,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল টার্নার। 'তাঁর বাড়িতে বুড়ো এক চীনা চাকরানী আছে, মিস্টার ফারকোপারের বাড়িতে চাকরানী ছিল গোস্ট পার্লের কথা সে জানে। জানে, মিস্টার ফারকোপারের স্ত্রীর লাশের সঙ্গে ওটাকে কবর দেয়া হয়েছে।' মুখের ঘাম মুছল সে। 'মিস্টার হুয়াঙ যেন সবজান্তা। আপনার কথা, মিস্টার ফারকোপারের কথা, ভারড্যান্ট ভ্যালির কথা, সবই তাঁর জানা। আমার সামনে টোপ ফেললেন তিনি। বুদ্ধিও বাতলালেন।

'বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি হিসেবে বদনাম রটানোর পরামর্শ দিলেন তিনি আমাকে, কি ভাবে কি করতে হবে তা-ও বুঝিয়ে দিলেন। এতে বাড়ির খরিদ্দার যাবে কমে, বাড়ি বিক্রি করতে দেরি হবে। গুপ্ত ঘরটা খোঁজার সুযোগ পাব, নেকলেসটা বের করে দিতে পারব। আমার কাছ থেকে দশ লাখ ডলারে কিনে নেবেন ওটা তিনি।

'আরও কিছু চালাকি করতে বললেন তিনি। ভূতটা প্রথম দেখা যাবে পোড়ো বাড়িতে, তারপর রকি বীচের এখানে-সেখানে, সব শেষে ভারড্যান্ট ভ্যালিতে।

গুজব ছড়াতে হবে। যাতে ভয় পেয়ে কাজ ফেলে পালায় শ্রমিকেরা। ঋণের দায়ে শেষে নিলামে উঠবে আঙুরের খেত আর মদের কারখানা। তখন নেকলেস বিক্রির টাকা দিয়ে সব কিনে নিতে পারব আমি।

'পুরো ব্যাপারটাই খুব সহজ মনে হয়েছিল আমার কাছে। মরিসনকে নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। প্ল্যান করলাম, কবে থেকে কিভাবে ভূত দেখানো শুরু করব। কিন্তু গোলমাল করে দিল কন্ট্রাক্টর, এক সপ্তাহ আগেই এসে বাড়ি ভাঙতে শুরু করল। সমস্ত প্ল্যান বদলে তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে হলো আমার। ছোটখাট ভুলচুক হয়ে গেল এ-কারণেই।

'বাড়ি ভাঙার খবর শুনে মরিসনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম রকি বীচে। কয়েকজন লোককে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভূত দেখালাম। তারপর গায়েব হয়ে গেলাম দুজনে। সে-রাতেই চলে এসেছি ভারড্যান্ট ভ্যালিতে। পর দিন আবার গেলাম, আমি একা। আমার দুর্ভাগ্য, পুলিশ ঢুকতে দিল না বাড়িতে, তাহলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হত না, আমার কণ্ঠস্বরও শুনতে না, ধরতেও পারতে না।'

'পারতাম,' বলল কিশোর। 'সেদিন আপনার কথা শুনতে পেতাম না বটে, কিন্তু আজ তো পেতাম। রহস্যের সমাধান করতে আরেকটু সময় লাগত, এই আর কি। আচ্ছা, সেফ থেকে নেকলেসটা তো আপনিই সারিয়েছেন, নাকি?'

'প্ল্যানটা আমারই,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল টার্নার। 'প্রেসিং হাউসে ভূত দেখানোর বন্দোবস্ত করলাম। গুজব বেশি করে ছড়ানোর জন্যে। নেকলেসটা রবিন, মুসা আর মিঙকে দেখালাম, সাক্ষী রাখলাম যে সেফেই ওটা রেখেছি। এই সময় খবর এল প্রেসিং হাউসে ভূত দেখা গেছে, উত্তেজনায় ভুলে যাওয়ার ভান করে সেফ খোলা রেখেই বেরিয়ে পড়লাম। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভান করে আবার তাড়াহুড়ো করে ফিরে এলাম। মরিসনকে দিলাম নেকলেসটা। সে আমাকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্যে আমার হাত পা বেঁধে রেখে গেল।'

'তুমি এত বড় শয়তান জানলে···ছিহ্।' ঘৃণায় মুখ বাঁকালেন মিস কৌন। 'আর দশটা চোরছ্যাঁচোরের সঙ্গে কোন পার্থক্য দেখছি না তোমার। নেকলেস জাহান্নামে যাক, ছেলেগুলোর কি হলো? ওদেরকে ফেরত পেলেই আমি খুশি। কোথায় ওরা?'

মাথা নাড়ল টার্নার। 'জানি না। সত্যি বলছি।'

'তোমার সত্যি আর কে বিশ্বাস করতে যাচ্ছে,' তীব্র কণ্ঠে বললেন মিস কৌন।

কিশোরের মনে হলো, সত্যি কথাই বলছে টার্নার। বলল, 'আমার মনে হয়, ওরা মরিসনকে সন্দেহ করেছে। হয়তো অনুসরণও করেছে। তাই কোথাও আটকে রেখেছে মরিসন।

মাথা দোলালেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'হতে পারে। আজ সারাদিনে মরিসনেরও পাত্তা নেই। কোথায় সে?'

'ছেলেগুলোকে না হয় লুকিয়ে রাখল,' প্রতিবাদ করল টার্নার, 'কিন্তু ঘোড়া? তিন-তিনটে ঘোড়া লুকাবে কোথায়? উপত্যকা চষে ফেলেছে লোকেরা, তাদের চোখে পড়তই।'

'কোথায় লুকিয়েছে সেটা আমরা কি জানি?' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন মিস কৌন।

'চোরে চোরে খালাত ভাই, সেটা তোমার জানার কথা।'

'কেউ যদি খালি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন খুঁজে পেত,' আফসোস করল কিশোর, 'তাহলেই খুঁজে বের করে ফেলতাম ওদের। কিন্তু চিহ্ন রেখে যেতে পেরেছে কিনা কে জানে। থাকলে চোখে পড়বে না কেন?'

ঘরে এসে ঢুকল সুই। 'শেরিফ এসেছেন, ম্যাডাম। বললেন খবর আছে।'

'জলদি নিয়ে এসো,' বললেন মিস কৌন।

ঘরে ঢুকলেন শেরিফ। সঙ্গে একটা ছেলে।

'কি খবর শেরিফ?' তর সইছে না আর মিস কৌনের। 'ওদের খোঁজ পাওয়া গেল?'

'না, ম্যাডাম,' মাথা নাড়ল শেরিফ। 'তবে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেখা গেছে। এই ছেলেটা দেখেছে।'

ময়লা পোশাক পরা ছেলেটা এগিয়ে এল। 'হ্যাঁ, ম্যাডাম। পাখির ডিম খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, পিপাসা পেল খুব। কয়েকটা পিপা দেখে পানি আছে কিনা উঁকি দিলাম, দেখি চিহ্ন।'

'কোথায়?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে কিশোর।

'মরুভূমির ধারে, পথে।'

'মরুভূমিতে, পিপার ভেতরে,' বিড়বিড় করলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'নাহ্, বিশেষ সুবিধে হবে না।'

'হতেও পারে,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলুন দেখে আসি।'

মিস কৌনও উঠলেন। 'আমিও যাব।'

'আমিও আসি,' বলল টার্নার।

'না,' ধমকে উঠলেন মিস কৌন, 'তোমার যেতে হবে না।'

তাড়াতাড়ি এসে শেরিফের পুরানো সিডানে উঠে গাদাগাদি হয়ে বসল ওরা।

বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা নির্জন জায়গায় দুটো পিপা পড়ে থাকতে দেখা গেল হেডলাইটের আলোয়।

'ওই যে, ওই দুটোই,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল ছেলেটা।

কাছে এসে থামল গাড়ি।

পিপাগুলো ভালমত দেখে বললেন মিস কৌন, 'পুরানো বাতিল জিনিস। এর মধ্যে আঙুর বা রস কোনটাই রাখা যাবে না। কিন্তু এখানে এনে ফেলল কে?'

পিপার ভেতরে ঝুঁকে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। একটা পিপার তলায় সবুজ চক দিয়ে আঁকা রয়েছে বড় একটা আশ্চর্যবোধক। 'হুঁম, রবিন ছিল এর ভেতরে।'

'বুঝেছি!' চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ মিস কৌন। 'এখানে পুরানো পিপা এতই সাধারণ জিনিস, কেউই সন্দেহ করেনি। কল্পনাও করেনি কেউ ওগুলোর ভেতরে ভরে মানুষ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এগুলোতে করেই ছেলেগুলোকে পাচার করেছে মরিসন। কিন্তু আছে তো দুটো। আরেকজনকে কি করে নিল?'

'কি শয়তানী বুদ্ধি!' বিড়বিড় করলেন শেরিফ। 'কিন্তু এখানে ফেলে গেল কেন

grohon.com

পিপাগুলো?'

'হয়তো গাড়ি বদল করেছে এখানে,' বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'মরিসনের লোক আগে থেকেই গাড়ি নিয়ে বসেছিল, নির্জন জায়গায় এসে পিপা থেকে ছেলেদেরকে বের করে অন্য গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্যান ফ্রানসিসকোয়। চলুন, জলদি বাড়ি চলুন। পুলিশকে টেলিফোন করতে হবে।'

ফিরে চলল গাড়ি। হেডলাইটের আলোয় পথের ধারে একটা কাগজের টুকরো পড়ে থাকতে দেখল কিশোর। খানিক দূরে একটা, তারপর আরেকটা। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। কই, আসার সময় তো দেখেনি? নাকি বেশি উত্তেজিত ছিল বলে খেয়াল করেনি? তাই হবে।

খানিক দূরে আরেকটা একই রকম কাগজের টুকরো চোখে পড়তেই গাড়ি থামাতে বলল কিশোর। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তুলে নিল টুকরোটা। টর্চের আলোয় দেখল, তাতে লেখা রয়েছে কিছু। আরে, রবিনের হাতের লেখা না! দ্রুত চলে এল গাড়ির কাছে। মিস্টার মিলফোর্ডকে ডাকল, 'আংকেল, দেখুন, রবিনের লেখা!'

ছেলের হাতের লেখা চিনতে পারলেন বাবাও।

লেখা রয়েছে ঃ ৪৭ খনি সাহায্য চাই!!!

'কি মানে এর!' আপনমনেই বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কিশোর, কিছু বুঝতে পারছ?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কিছুই বুঝছি না। হতে পারে সাতচল্লিশ মাইল দূরের কোন খনির কথা বলছে।'

'সাতচল্লিশ মাইল দূরে কোন খনি নেই,' বললেন মিস কৌন, 'যা আছে, মাইল দশেকের মধ্যেই রয়েছে। এখানকার কোন খনিই খোঁজা বাদ রাখেনি।'

স্থির দৃষ্টিতে কাগজটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। দশ মাইলের মধ্যেই কোন খনিতে রয়েছে ওরা খনির উল্লেখ তাই বোঝাচ্ছে। কিন্তু সাতচল্লিশ মানে কি তাহলে?

ষোলো

গুহার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে আছে রবিন আর মিঙ। পা বাঁধা। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে ওদের দু'পাশে বসে আছে দু'জন লোক, পাহারায়।

গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

স্টেশন ওয়াগনের পেছনে তুলে চাদর দিয়ে ঢেকে নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে হ্যাশনাইফ ক্যানিয়নে। গাড়ি যতদূর আসতে পারে এসেছে, তারপর ঘুম থেকে তুলে হাঁটিয়ে এনেছে বাকি পথ।

মুসাকে নিয়ে নেকলেস আনতে গেছে মরিসন।

সুড়ঙ্গের সঙ্কীর্ণ অংশটার কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে। এর পর আর মরিসন যেতে পারবে না। মুসার হাতে একটা টর্চ, ধরিয়ে দিয়ে শাসিয়ে বলল, 'যাও। কোন রকম চালাকি করবে না। তুমি ফিরে না এলে তোমার দুই বন্ধুর গলা কেটে ফেলে

দেব। মনে থাকে যেন।'

না ফেরার কোন ইচ্ছে নেই মুসার। সেকথা মরিসনকে জানিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে।

দুইবার গেছে-এসেছে এই পথে, তৃতীয়বার যেতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। পেরিয়ে এল সঙ্কীর্ণ অংশটা। তারপর চিহ্ন ধরে ধরে এসে ঢুকল সেই গুহায়, যেখানে লুকিয়েছে নেকলেস। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, নেকলেসটা দিয়ে দেবে মিস্টার হুয়াঙকে, কোনরকম চালাকি করবে না। অহেতুক ঝুঁকি নেয়ার কোন অর্থ নেই।

কিন্তু কঙ্কালটা যেখানে থাকার কথা সেখানে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল। ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত শিরশির করে নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। কঙ্কালের চিহ্নও নেই, মাথার খুলিটাও গায়েব। সে জায়গায় মস্ত এক কালো গর্ত, বড় পাথর ধসে পড়ে রয়েছে। নিশ্চয় গুঁড়িয়ে দিয়েছে হাড়, সেই সঙ্গে ভঙ্গুর মুক্তোগুলোও।

প্রমাদ গুনল মুসা। এখন কি করবে? মরিসনকে বিশ্বাস করানো যাবে না। কি করবে? ভাবতে ভাবতেই ফিরল সে। পাথরের আড়াল থেকে বের করে নিল কালো টর্চটা। মরিসন কি খুলে দেখবে? নাকি না দেখেই ছেড়ে দেবে তাদেরকে?

ঘটল কি করে এই কাণ্ড? মনে পড়ল মুসার, দ্বিতীয়বার সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ দিয়ে ফেরার পথে ভূমিকম্প হয়েছিল। সে-কারণেই হয়তো ধসে পড়েছে পাথর। একেই বলে দুর্ভাগ্য। পড়ার আর জায়গা পেল না, পড়ল একেবারে কঙ্কালটার ওপর।

ভগ্নহৃদয়ে কালো টর্চটা নিয়ে ফিরে চলল মুসা। জানে, না দেখে নিশ্চিন্ত হবে না মরিসন, তবু ক্ষীণ একটা আশা দুলছে মনে। যদি না দেখেই ছেড়ে দেয়?

সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এল মুসা।

দেখেই ধমকে উঠল মরিসন, 'এত দেরি কেন? কই, এনেছ?'

নীরবে কালো টর্চটা মরিসনের হাতে তুলে দিল মুসা।

হাতে নিয়ে একবার ওজন পরীক্ষা করেই মাথা নাড়ল মরিসন। 'হুঁ। চলো, এগোও।'

কিন্তু দশ পা এগিয়েই থেমে গেল মরিসন। 'আছে কিনা দেখি তো? বিচ্ছুটাকে বিশ্বাস নেই।' টর্চের পেছনের ক্যাপ ঘুরিয়ে খুলতে শুরু করল।

দৌড় দিল মুসা। দুই লাফে এসে তার কলার চেপে ধরল মরিসন, ল্যাঙ মেরে ফেলে দিল মাটিতে। দ্রুত হাতে ক্যাপ খুলে টর্চের ভেতর থেকে বের করে আনল রুমালে বাঁধা পাথরের পুঁটুলি।

গর্জে উঠে একটানে ছুরি বের করল মরিসন। উঠে দাঁড়িয়েছে মুসা। ছুরির চোখা ফলা তার পিঠে ঠেসে ধরে বলল ফোরম্যান, 'গোলমাল করলে কি করতে হবে বলেই দিয়েছেন মিস্টার হুয়াঙ। জবাই করব আমি তোমাদের। নেকলেসটা কোথায়?'

'নেই। পাথর পড়ে ভেঙে গেছে,' মিনমিন করে বলল মুসা।

'চুপ! চালাকির আর জায়গা পাওনি! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। তোমাকে কিছু বলব না, তোমার বন্ধুদের আঙুল কাটব এক এক করে। চলো, হাঁটো। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। হাঁটো,' ছুরির মাথা দিয়ে মুসার পিঠে খোঁচা লাগাল মরিসন।

গুহাটায় ফিরে এল দু'জনে। টর্চের আলোয় দেখা গেল তেমনি বসে আছে রবিন আর মিঙ। তার পাশে মুখ গুঁজে বসে আছে দু'জন লোক।

'এই···,' বলেই থেমে গেল মরিসন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দু'জন, হাতে রিভলভার। তার রেখে যাওয়া প্রহরীরা নয়, অন্য লোক।

প্রায় একই সঙ্গে গুহার চারপাশ থেকে জ্বলে উঠল ছয়টা টর্চ। শেরিফের ধমক শোনা গেল, 'খবরদার, নড়বে না, খুলি উড়িয়ে দেব!'

কিন্তু নড়ল মরিসন। চোখের পলকে মুসার কলার চেপে ধরে একটানে তাকে নিয়ে ঢুকে গেল আবার সুড়ঙ্গে। কেউ গুলি করার সাহস পেল না, মুসার গায়ে লাগতে পারে। এতই তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ঘটনাটা, কেউই কিছু করতে পারল না। তবে দাঁড়িয়েও থাকল না। টর্চ আর রিভলভার হাতে ছুটে এসে ঢুকল সুড়ঙ্গে।

ঝাড়া দিয়ে মরিসনের হাত থেকে কলার ছুটিয়ে নিয়ে দৌড় দিল মুসা। এসে পড়ল একেবারে শেরিফের গায়ে।

'কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

আঙুল তুলে একটা সুড়ঙ্গ মুখ দেখিয়ে দিল মুসা, কথা বলতে পারছে না, হাঁপাচ্ছে।

'যাক,' বলল শেরিফ। 'আজ আর খুঁজব না। খনির মুখে পাহারা রেখে যাব। কাল সকালে এসে ধরব ব্যাটাকে।'

ফেরার পথে গাড়িতে রবিন জানতে চাইল, ওরা কোথায় আছে তা জানা গেল কি করে।

'কিশোরের কৃতিত্ব,' বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'পথের ধারে তোমার লেখা কাগজ তার চোখেই পড়েছে। বোঝা গেল, খনিতে রয়েছ তোমরা। কিন্তু কোনটায়? যত খনি আছে, জানামত সব খুঁজেছে মিস কৌনের লোকেরা। শেষে তাঁরই মনে পড়ল একটা কথা, প্রায়ই নাকি মিঙ কোন এক খনিতে যেত, একজন লোকের সঙ্গে। লোকটার নাম ন্যাট বারুচ, স্যান ফ্রানসিসকোর এক হাসপাতালে রয়েছে এখন। অসুস্থ। তাকে ফোন করলেন মিস কৌন। জানা গেল, আরেকটা খনিমুখ আছে, যেটা খোঁজা হয়নি। দুটো হলদে পাথর আছে খনির মুখে। তখনই লোক জোগাড় করে ওটাতে এসে ঢুকলাম। তারপর আর কি? ঢুকেই দেখি তুমি আর মিঙ···' থামলেন তিনি। 'আচ্ছা, সাতচল্লিশ লিখেছিলে কেন? মানে কি?'

হাসল রবিন। 'কিশোর এর মানে বের করতে পারেনি?'

'না,' বলল কিশোর।

'তুমি বোঝো না, এমন জটিল সমস্যাও তাহলে আছে,' বলল রবিন। 'স্টেশন ওয়াগনের পেছনে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আমাদেরকে। নোট বই থেকে পাতা ছিঁড়ে তাতে সংকেত লিখে একটা ফাঁক দিয়ে ফেলেছি। একটা মাত্র পাতা ফেললে লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই একটার পর একটা পাতা ছিঁড়ে একই কথা বারবার লিখে ফেলেছি। সিরিয়াল নম্বর দিয়ে দিয়েছি এক দুই করে। ধরে নিয়েছি, বেশি পাতা ফেললে একটা অন্তত কারও না কারও চোখে পড়বেই। তোমরা যেটা পেয়েছ, সেটা সাতচল্লিশ নম্বর।'

'নম্বর দিয়েছ কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এমনি। মনে হলো, তাই দিলাম।'

'খনির নাম-ঠিকানা লিখলে না কেন?'

'নাম জানি না। তাছাড়া বেশি লেখার সুযোগ কোথায়? চাদরের নিচে অন্ধকারে বসে লিখেছি, চলন্ত গাড়িতে। ওটুকু যে লিখতে পেরেছি তা-ই বেশি।'

সতেরো

পরদিন ধরা পড়ল না মরিসন। ধরা গেল না কোনদিনই। তার আর কোন খোঁজই কেউ কোনদিন পেল না। হয়তো এমন কোন সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে পালিয়েছে সে, যেটা সম্পর্কে আর কেউই জানে না। কিংবা হতে পারে, কোন সুড়ঙ্গ বা গুহায় বেকায়দা অবস্থায় আটকা পড়ে গাধাটার মতই মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করেছে।

মিস্টার মিলফোর্ড ফিরে গেলেন রকি বীচে।

মিঙের দাদীমার মেহমান হয়ে আরও কয়েক দিন ভারড্যান্ট ভ্যালিতে থাকল তিন গোয়েন্দা।

যেসব জায়গা দেখা হয়নি, ঘুরে ঘুরে সব দেখাল তাদেরকে মিঙ। চমৎকার কেটে গেল কয়েকটা দিন।

ভূতের ব্যাপারটা ভুয়া, সব টার্নারের শয়তানী, এটা প্রকাশ পেতেই আবার ফিরে এল শ্রমিকের দল, শেষ মুহূর্তে রক্ষা পেল পাকা আঙুর, তাড়াতাড়ি তুলে পাঠানো হলো ওগুলোকে প্রেসিং হাউসে, রাতদিন পরিশ্রম করে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হলো।

টার্নারকে পুলিশে দেননি মিস কৌন, আত্মীয় বলে মাফ করে দিয়েছেন। তবে তাড়িয়ে দিয়েছে ভারড্যান্ট ভ্যালি থেকে। সাবধান করে দিয়েছেন, ওখানে আর কোন দিন তাকে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে দেবেন।

অবশেষে একদিন রকি বীচে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। খবর পেয়ে সেদিনই এসে তাদের সঙ্গে দেখা করলেন পুলিশ-প্রধান ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। বার বার ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'উফ্, কি মানসিক অশান্তি থেকেই না মুক্ত করেছ তোমরা আমাকে। নিজের চোখে ভূত দেখলাম অথচ ভূত বিশ্বাস করি না, রহস্যটা রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল আমার।'

পকেট থেকে তিনটে সবুজ কার্ড বের করলেন ক্যাপ্টেন, একেকজনকে একটা করে দিলেন।

লেখা রয়েছে ঃ

এই কার্ডের বাহক ভলানটিয়ার জুনিয়র, রকি বীচ পুলিশকে সহায়তা করছে। এদেরকে সাহায্য করা মানে, পক্ষান্তরে পুলিশকেই সাহায্য করা।

সার্টিফিকেটের নিচে ক্যাপ্টেন ফ্লেচারের সই আর সীল।

আনন্দে লাল হয়ে গেল কিশোরের মুখ। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ক্যাপ্টেন। গোয়েন্দাগিরি করা এখন অনেক সহজ হয়ে গেল আমাদের জন্যে।'

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'থ্রী চিয়ার্স ফর···'

grohon.com

grohon.com

'ক্যাপ্টেন ফ্লেচার!' সমস্বরে শ্লোগান দিল কিশোর আর রবিন।

হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'এখন থেকে কোনরকম অসুবিধে হলেই আমাকে জানাবে। যত ভাবে পারি, সাহায্য করব।'

বাইরে বোরিস আর রোভারকে খাটাচ্ছেন মেরিচাচী, চেঁচামেচি শুনে উঁকি দিলেন অফিসে। হাসিমুখে বেরিয়ে আসছেন ক্যাপ্টেন ফ্লেচার, ব্যাপারটা অবাকই লাগল তাঁর কাছে। 'কি ব্যাপার, চীফ? আপনার মুখে হাসি অবাক কাণ্ড!'

'হাসব না বলছেন কি?' হাসতে হাসতেই বললেন ক্যাপ্টেন। 'ভূতে ধরেছিল আমাকে, আপনার ছেলেরা ছাড়িয়েছে।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলেন মেরিচাচী। 'ছেলেগুলো আপনার মাথাও খেয়েছে তাহলে?...যাচ্ছেন যে? চা খেয়েছেন?'

'না, খাইনি। বসব?'

'বসুন বসুন, আমি এখুনি নিয়ে আসছি। তারপর ভূতের গল্প শুনব।'

বড়দের কথায় আর থাকল না তিন গোয়েন্দা, বেরিয়ে এল। রওনা হলো হেডকোয়ার্টারে।

তার পরদিন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে এল তিন গোয়েন্দা। তাদেরকে দেখেই বলে উঠলেন তিনি, 'এই যে, এসে পড়েছ, বসো। খবরের কাগজে পড়েছি সব। দু'মিনিট বসো, হাতের কাজটা সেরে নিই, তারপর শুনব।'

কাজ শেষ করে কাগজপত্র এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রাখলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। হাত বাড়ালেন। ফাইলটা বাড়িয়ে দিল রবিন।

মন দিয়ে রবিনের লেখা রিপোর্ট পড়লেন তিনি। মুখ তুললেন। 'মিস্টার হুয়াঙের খবর কি? তার কথা তো আর কিছু লেখোনি।'

রবিন বলল, 'আমার ওখানে থাকতেই একদিন মিঙের দাদীমার বাড়িতে এল দু'জন চীনা। তারা বলল, নেকলেসটা কোথায় রেখেছিল মুসা দেখিয়ে দিলে মিস্টার হুয়াঙ কিস্তিতে ঋণের টাকা নিতে রাজি আছেন। দেখিয়ে দিল মুসা। নেকলেস পাওয়া যায়নি, তবে ওখানকার সমস্ত ধুলো পোঁটলা করে নিয়ে গেছে লোকগুলো।'

'মুক্তোর গুঁড়ো মেশানো ধুলো খেয়েই বেঁচে থাকার ইচ্ছে। হুঁহ, কতরকম লোক যে আছে দুনিয়ায়! সব কুসংস্কার।' কিশোরের দিকে ফিরলেন, 'কিশোর, কুকুরের উল্লেখ আছে রিপোর্টে, কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয়নি। খুলে বলো তো।'

'কুকুরটার কথা ভাবতে শার্লক হোমসের একটা গল্প মনে পড়ে গেল,' বলল কিশোর। 'আপনার নিশ্চয় মনে আছে, স্যার, ডক্টর ওয়াটসনকে শার্লক হোমস কি বলেছে, রাতে কুকুরের আচরণ সম্পর্কে?'

'নিশ্চয়!' বুঝে ফেললেন চিত্রপরিচালক, চেহারার ভাবেই প্রকাশ পেল সেটা 'ডক্টর ওয়াটসন বলছে, রাতে অদ্ভুত কিছুই করে না কুকুরটা। শার্লক হোমসের জবাব, করে না যে সেটাই তো অদ্ভুত।'

'বুঝেছেন, স্যার।'

রিপোর্টের পাতা উল্টে একটা জায়গায় এসে থামলেন চিত্রপরিচালক। 'এই যে, এখানে লেখা রয়েছে, ছোট্ট কুকুরটা শান্ত ছিল লোকটার কোলে, চেঁচামেচি করেনি। কিশোর, না বলে পারছি না, তোমার ব্রেনটা অসাধারণ। এই অতি সামান্য একটা ব্যাপার থেকে রহস্যের সমাধান করে ফেললে?'

মুসা আর রবিনের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। হেঁয়ালি মনে তাদের কাছে কিশোর আর চিত্রপরিচালকের কথাবার্তা।

'কুকুরটা শান্ত ছিল, তাতে কি?' আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কুকুর আর বিড়ালের স্বভাব জানো?' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'রাতের বেলায় ভয় পেলে কিংবা অদ্ভুত কিছু দেখলে কি রকম উত্তেজিত হয়ে ওঠে? রোম খাড়া হয়ে যায়, চিৎকার করে। ছোট্ট কুকুরটা সেরাতে কিছুই করেনি, তার মানে কি?'

'ও, বুঝেছি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'যেহেতু ভূত ছিল না সেটা, সেজন্যেই চেঁচামেচি করেনি কুকুরটা। আমাদের কাছে অস্বাভাবিক, কিন্তু তার কাছে ব্যাপারটা সাধারণ ছিল। ইস্, আমরা কি! এই সহজ কথাটা...'

'তোমরা? আর দশটা ছেলের চেয়ে বুদ্ধিমান, সাহসী, রীতিমত দুঃসাহসী,' বললেন চিত্রপরিচালক, 'নেকলেসটা যেভাবে লুকিয়েছ, মরিসনকে ধোঁকা দিতে চেয়েছ, সেটা বুদ্ধি আর সাহসের পরিচয় নয়? রবিন যে ঘুমের ভান করে থাকল সেটা বুদ্ধির পরিচয় নয়?...'

'হ্যাঁ, ঠিক,' হাসল মুসা। 'মিস্টার হুয়াঙকেও বোকা বানিয়ে ছাড়ল। সম্মোহিত হওয়ার ভান করে চোখ বুজে রইল। তারপর সুযোগমত সাহায্যের আবেদন ছড়িয়ে দিল পথে পথে। এটা শুনলে মিস্টার হুয়াঙের চেহারা কেমন হয় দেখতে ইচ্ছে করছে। হা-হাহ্।'

'আজ তাহলে উঠি, স্যার?' ওঠার উপক্রম করল কিশোর।

'আরে বসো,' হাত নাড়লেন চিত্রপরিচালক। 'আসল কথাটাই তো জানা হয়নি এখনও। ভূতের ব্যাপারটা ফাঁকিবাজি, কিন্তু একটা কিছু তো দেখা গেছে। কি ওটা?'

'কুকুরের ব্যাপারে ভাবতে গিয়েই ওটা বুঝতে পেরেছি। কুকুরটা তেমন বিশেষ কোন গন্ধ পেল না, বিশেষ কিছু দেখল না, তার আচরণ থেকেই এটা স্পষ্ট।...ঘরটা অন্ধকার করে দিই, স্যার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও।'

জানালার সবগুলো পর্দা টেনে দিল কিশোর। আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিল। 'ডানে, দেয়ালের দিকে তাকান।'

রবিন আর মুসাও তাকাল। সবুজ আলো ফুটছে শাদা দেয়ালে। আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হলো আলো। যেন একটা মানুষের রঙিন ছায়া, নড়ছে। দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ভেসে চলে গেল যেন ওটা। ম্লান হতে হতে মিলিয়ে গেল।

আলো জ্বেলে দিল আবার কিশোর।

'তাজ্জব ব্যাপার।' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

grohon.com

'বুঝেছি,' মাথা ঝোঁকালেন চিত্রপরিচালক। 'আরও আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। এতদিন সিনেমা লাইনে আছি...'

'কী, স্যার?' কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারছে না মুসা।

'প্রোজেক্টর। মিনি প্রোজেক্টর। লাইটিং খুব কমিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দেয়ালে ছবি ফেলা হয়েছে, আর কিছু না। রঙিন ছবি।'

'কিশোরের হাতের ওই টর্চটা?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'এটা টার্নারের অফিসে খুঁজে পেয়েছি। জাপানের তৈরি। দেয়ালে ছবি ফেলে টর্চটা যেদিকে ঘোরাবে সেদিকেই যাবে ছবি। ওপরে নিচে কিংবা পাশে দ্রুত নাড়ালে মনে হবে ছবিটা নাচছে। একটা সুইচ আছে, এই যে এটা, এটা দিয়ে লাইট কন্ট্রোল করা যায়, আলো কমানো বাড়ানো যায়। মিস্টার হুয়াঙ দিয়েছেন এটা টার্নারকে।'

'কি করে জানলে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'টার্নার বলেছে।'

'টার্নারই তাহলে ভূত দেখিয়েছে?' মুসা বলল।

'সে-ও দেখিয়েছে, মরিসনও দেখিয়েছে। টর্চের মত দেখতে, হাতে নিয়ে ঘুরলে কেউ সন্দেহ করে না। পকেটেও জায়গা হয়,' পকেটে ঢুকিয়ে রাখল কিশোর। 'তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে স্যুভেনির রাখব এটা।' চিত্রপরিচালকের দিকে ফিরে বলল, 'তাহলে এখন যাই, স্যার।'

'কিছু খাবে না? আইসক্রীম?'

মুসার মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেল, কিন্তু সেদিকে খেয়াল না দিয়ে উঠে পড়ল কিশোর।

'না, স্যার, বাড়ি গিয়ে একবারে খাব। চলি।'

একে একে বেরিয়ে গেল ওরা অফিস থেকে।

পেছনে তাকিয়ে রইলেন চিত্রপরিচালক। আপনমনেই বিড়বিড় করলেন, 'আশ্চর্য এক ছেলে! শার্লক হোমসের কিশোর সংস্করণ। শুধু একটা কুকুরের আচরণ থেকেই...' হাত বাড়িয়ে বেলপুশ টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন। লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

—ঃ০ঃ—

Grohon // Adhare Alor Pothojatri

Grohon
Adhare Alor Pothojatri